আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক ১৮২

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৮২ তম সংখ্যা এপ্রিল'১৬
জমাদিউস সানী ১৪৩৭ হিজরী

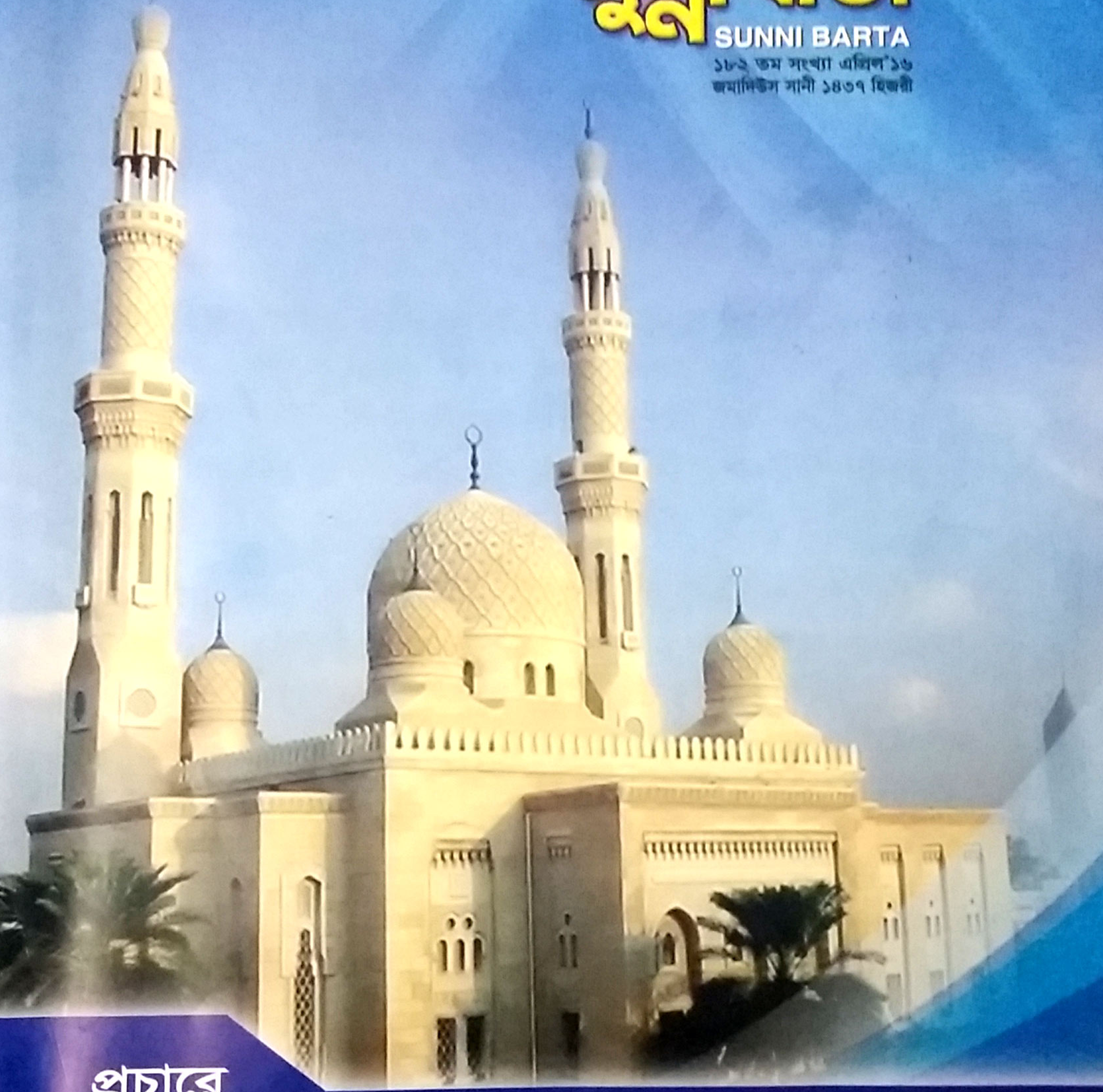

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

সূচীপত্র

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন - -০৩

দরসে হাদীস

নবীজির ইলমে গায়ব ---------------- -০৭

তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব) ------------------ -১০

খারেজী ও রাফেযী ঃ একটি পর্যালোচনা- -১৫

দেশ ও জাতির সৌভাগ্যের অনন্য প্রতীক হযরত শাহ্ জালাল মুজার্‌রাদ ইয়ামেনী (রাঃ) -১৯

ইসলামের বাস্তব কাহিনী --------------- -৩০

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী।

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক- 12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা।

মোহাম্মদ আবদুর রব
মা নীড়, ১৩২/৩, আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৭২৭৫১০৭, মোবাইল: ০১৭২০ ৯০৬ ৯৯৬

সম্পাদকীয়

ঈমান- আকীদা রক্ষা করুন

একজন মুসলমানের সবচেয়ে 'মূল্যবান সম্পদ হলো- ঈমান ও আকীদা। ঈমান আকীদা শুদ্ধ তো তার সকল আমল ঠিক। ঈমান-আকীদা ঠিক নেই তো নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত থেকে শুরু করে তার সমস্ত আমল বেকার। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেকটি দল জাহান্নামে যাবেঃ একটিমাত্র দল বেহেস্তে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, ঐ দল কোনটি ? যে দলে আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন, ঐ দলের নাম ' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত'। সুতরাং, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হল ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও মূল আকীদা। অতএব, সুন্নী আকীদার বিপরীত সকল মতবাদ, ভ্রান্ত ও বাতিল। যুগে যুগে আহলে সুন্নাতের কিছু মৌলিক নিদর্শন থাকে। ইসলামী শরীয়তের সমর্থিত ও মীমাংসিত কিছু আমল নিয়ে যখন বিরুদ্ধবাদীরা বিতর্ক করে এবং সমাজে ফিৎনা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালায়, তখন ঐ আমল গুলোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রঃ) র যুগে বাতিল পন্থীরা কিছু বিষয় নিয়ে বির্তক করত। তাই তৎকালীন সময়ে ঐ বিষয় গুলোই আহলে সুন্নাতের মৌলিক নিদর্শন বলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ঘোষণা দেন। তিনি বলেন- "তাজিমুশ শাইখাইন হুব্বুল খুতুনাঈন ওয়াল মাসহু আলাল খুফ্‌ফাইন" হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) র প্রতি শ্রদ্ধা, নবীজি দুই জামাতা তথা হযরত উসমান ও আলী (রঃ) র প্রতি মুহাব্বত প্রদর্শন এবং মোজার উপর মাসেহ করাই হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিদর্শন। সুতরাং বুঝা গেল ইসলামের আকীদার স্বীকৃত যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় সে বিষয়ের পক্ষে কথা বলা হক্কানী আলেমদের দায়িত্ব। যেমন, বর্তমানে মিলাদ- কিয়াম, উরছ, ফাতিহা নবীজির ইলমে গায়েব, হাজির- নাজির, হায়াতুন্নবী, ঈদে মিলাদুন্নবী ইত্যাদি হলো বর্তমান যুগের সুন্নীয়তের নিদর্শন। এসব যারা বিশ্বাস করে তারাই সুন্নী আর যারা এর বিরোধীতা করে তারা বাতিল মহাবলম্বী। তাই আসুন

সুন্নীয়তের পথে চলি; ঈমান আকীদা রক্ষা

৩০ মার্চ ২০১৬

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রাঃ)

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (٢٣٢)

হে প্রথম স্বামীগণ! যখন তোমরা তালাকে রেজয়ী বা বায়েন তালাক দিবে এবং ইদ্দতও শেষ হয়ে যাবে তখন মেয়ের অভিভাবকরা মেয়েকে বাধা দিতে পারবে না হিল্লালার মাধ্যমে তোমাদের কাছে পুনরায় ফেরত আসতে। তোমরা স্বামী একবার ঘর ভাঙ্গার পর আবার জোড়া লাগাতে চাইলে এ পথে কেউ বাধা দিতে পারবে না। তবে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিল্লালা বিবাহের সুরতে ফিরে আসতে কমপক্ষে ৯ মাস সময় লাগবে। এ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় তাহলে পথে বাধা নাহি রয়। এই নসিহত হলো যারা আল্লাহ ও আখেরাতের মধ্যবর্তী যাবতীয় বিষয়ে বিশ্বাস রাখে। এতে রয়েছে পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা। আল্লাহর আদেশের গুপ্ত রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন- তোমরা তার কিছুই জানো না।"

খোলাসা তাফসীর ঃ

হে প্রথম স্বামী যখন তোমার স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং ইদ্দত পার হয়ে যাবে তখন স্ত্রীর পছন্দমতো দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করো না। স্বাধীনভাবে স্বামী গ্রহণ করতে দিও। ঘুষ নিয়ে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিও না। এটা তোমাদের সামাজিক কুপ্রথা। এটা মস্ত বড় যুলুম। তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে সুখী হবে এতে তোমাদের গায়ে জ্বালা হবে কেন? এই নসিহত হলো আল্লাহ, রাসূল (দঃ) ও আখেরাতে বিশ্বাসীদের জন্য। উলুহিয়াত, নবুয়ত ও আখেরাত হলো ইসলামের মূল ঈমান। তোমাদের বাধাদানের সাক্ষী আল্লাহ এবং নবী। এর পরিণাম ফল ভোগ করবে আখেরাতে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর রাস্তা ছেড়ে দেয়ার মধ্যে রয়েছে মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা।

খোলাসা তাফসীর-

হে দ্বিতীয় স্বামী : তুমি হাল্লালার উদ্দেশ্যে বিবাহ করেছো মানবিক কারণে। তুমি তালাক দেয়ার পর ঈর্ষাকাতর হয়ে স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঘরে ফেরত যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করো না। তারা সুখের নীড় গড়ে তুলুক, সুখে-শান্তিতে থাকুক এটাই কামনা করা উচিত। এ পথে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করা ঈমান ও পবিত্রতার খেলাফ। মোট কথা। হাল্লালা বিবাহের বৈধতা অত্র আয়াত দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। এটাকে ঘৃণা করা যাবে না। এটা আইনি ব্যাপার এবং সামাজিক ও মানসিক বিষয়। এতে জড়িত আছে আবেগ, অনুভূতি ও জীবন মরণের প্রশ্ন। এটি ইসলামের সূক্ষ্ম মানসিক বিশ্লেষণ। উচ্চাঙ্গের দর্শন এতে নিহিত।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

১. সাবালেগ মেয়ের বিবাহ স্বাধীন ও অলির অনুমতি শর্ত নয়, তবে উত্তম।

২. তবে সাবালেগ মেয়ে যদি শরয়ী অথবা সামাজিক ও পারিবারিক প্রথা লংঘন করে

তাহলে অভিভাবক বাধা দিতে পারবে। যেমন কম মোহরে বা নিচু বংশের অভিভাবকরা অবশ্যই আইনতঃ বাধা দিতে পারবে। ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ আছে, মেয়ে যদি কুফু বা বংশীয় সামঞ্জস্য রক্ষা না করে তাহলে ঐ বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এসব মাসআলার মূল উৎস হলো উল্লেখিত আয়াত। এখান থেকেই এসব মাসআলা বের করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কালামের প্রতিটি শব্দ বহু আইনের উৎস।

৩. বিবাহে ছেলে মেয়ে উভয়ের সম্মতি (অনুমতি) প্রয়োজন। মেয়ের ইযিন এবং ছেলের কবুল হলো অনুমতি।

৪. মুসলিম পারিবারিক আইন ভিন্ন জাতির জন্য প্রযোজ্য নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক আইন সবার জন্য সমান। অপরাধ বিষয়ক আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য। অন্য ধর্মে সুদ, ঘুষ, মদ, গাঁজা ইত্যাদি সিদ্ধ হলেও ইসলামী রাষ্ট্রে তা নিষিদ্ধ।

৫. প্রস্তাবিত স্বামীকে স্বামী বলে সম্বোধন করা যাবে অর্থাৎ- "প্রস্তাবিত স্বামীর কাছে বিবাহ হতে বাধা দিও না।"

৬. স্বামী অথবা স্ত্রীর পক্ষে যৌতুক নেয়া ঘুষের শামিল ও হারাম।

প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

প্রশ্ন: শানে নুযুল অনুযায়ী "বারণ করিও না তালাক প্রাপ্তা মেয়েকে"-এই সম্বোধন যদি মেয়ের অভিভাবককে করা হয়- তাহলে আয়াতের শুরুতে যে তালাকপ্রাপ্তা স্বামীকে সম্বোধন করে শর্তারোপ করা হয়েছে তার জায়গা কোথায় গেল? এক আয়াতে দু'ধরণের লোককে সম্বোধন করা তো অংশের সম্বোধন তালাকদাতা স্বামী হওয়াই উচিত।

উত্তর: আল্লাহর কাছে সবাই হাজির। সুতরাং ইশারায় একবার স্বামীকে, দ্বিতীয়বার মেয়ের অভিভাবককে সম্বোধন করা বালাগাতের খেলাফ নয়। দেখুন- হযরত ইউসুফ যোলায়খার ঘটনায় স্বামী আযিয মিছির যখন দোলনার শিশুর মুখে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষের প্রমাণ পেলেন তখন একই বাক্যে উভয়কে সম্বোধন করেছিলেন। "হে ইউসুফ, তুমি এ বিষয়ে চিন্তা করো না। আর হে যোলায়খা তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।" এখানে একই সাথে ইউসুফ ও যোলায়খাকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু যোলায়খার নাম উল্লেখ না করে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। তদ্রূপ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক তালাকদাতার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করে এক রকমের হুকুম দিয়েছেন এবং নাম উল্লেখ না করে অভিভাবকদের ইঙ্গিতে বলেছেন। সুতরাং এ ধরণের কথা অভিভাবকদের বালাগাত, এতে সন্দেহ নেই। এটা তাফসীর কারক ওয়ায়েযীনদের জন্য খুবই উপকারী ব্যাখ্যা।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

সরল অর্থ ঃ ২৩৩. মায়েরা আপন শিশুকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে স্বামীর পক্ষে, যে স্বামী দুধ পানের সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী পিতার উপর দায়িত্ব হলো দুধপানকারিণীর খোরপোষের ব্যবস্থা করা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। কাউকে তার সাধ্যাতীত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। মাকে তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং পিতাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিশদের উপরও একই দায়িত্ব, যিনি সন্তানের পিতার স্থলাভিষিক্ত। তারপর যদি পিতা-মাতা উভয়ের রেযামন্দি ও মতামতের ভিত্তিতে দুধপানের সময়ের ভেতরেই দুধ ছাড়াতে চায়- তাহলে কারোরই পাপ হবে না। আর যদি তোমরা ধাত্রীর দ্বারা সন্তানের দুধপান করাতে চাও তাহলে যদি প্রচলিত নিয়মে বা নির্ধারিত বিনিময় দিয়ে দাও, এতেও কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমলই প্রত্যক্ষকারী।"

বর্ণনার ক্রমধারা ঃ

এতক্ষণ তালাক সংক্রান্ত জটিল বিষয়ে আলোচনা সমাপ্ত করে এখন আরেকটি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হচ্ছে। তাহলো সন্তানবতী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে যদি দুধপানরত শিশু থাকে আর তা হলে তার অধিকার কি হবে এবং তার লালন পালনের দায়িত্ব কে বহন করবে? অথবা আপন স্ত্রী দুধপান করানোর সময় কি কি সুবিধা পাবে? অথবা ধাত্রী নিয়োগ করা হলে তাকে কি সুবিধা দিতে হবে? এবং দুধপানের মুদ্দত আইনতঃ কতদিন ধার্য করতে হবে? এসব বিষয়ে অত্র ২৩৩ নং আয়াতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ

১. وَالْوَالِدَاتُ অর্থ "দুধপানকারিণী মা সমূহ।" এই মা তিন প্রকার। শিশুর পিতার গৃহে অবস্থানকারিণী মা, তালাকপ্রাপ্তা মা এবং ধাত্রী মা। সন্তানকে দুধ পান করার মুদ্দত এবং খোরপোষ সবারই একরকম হবে। ধাত্রীকে মা বলার কারণ হলো যাতে সে নিজ সন্তান মনে করে দুধ পান করায়- ভাড়াটিয়া হিসাবে নয়। উল্লেখ্য, ওয়ালেদ অর্থ জন্মদাতা পিতা এবং أب অর্থ পিতা, চাচা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি। ওয়ালেদাহ অর্থ গর্ভধারিণী মা এবং أم অর্থ মা সৎমা, দাদী, চাচী ইত্যাদি।

২. পিতার পক্ষে মা দুধ পান করাবে। দুধপান করানোর মূল দায়িত্ব পিতার। স্ত্রী তার পক্ষে দুধপান করাবে। সুতরাং দুধপান করানো পিতার উপর ফরয, স্ত্রীর উপর নয়।

৩. "পিতার উপর দায়িত্ব হলো দুধপানকারিণী তিন প্রকারের যে কোন প্রকারের মায়ের যাবতীয় খোরপোষের ব্যবস্থা করা।

৪. দুধপানকারিনী মাকে সন্তানের দুধপানের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা যাবে না। দুধপান করানো তার ইচ্ছাধীন।

৫. আর পিতাকেও সন্তানের দুধপান করানোর ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। পিতার সাধ্য নেই ধাত্রী রাখার অথবা আলগা দুধ কেনার। এমতাবস্থায় স্ত্রীও দুধপান করাতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।

৬. পিতার অবর্তমানে যে উত্তরাধিকারী হবে তার উপরও একই হুকুম।

৭. "যদি স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে গুনাহ হবে না। এই কথা দ্বারা প্রমাণিত

হয় দুধপান করানোর ইদ্দত দু'বছর ওয়াজিব নয় বরং উত্তম। আড়াই বছর পর্যন্ত দুধপান করানো যাবে। যদি দু'বছর বাধ্যতামূলক হতো তাহলে স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শ ও রেযামন্দির কথা বলা হতো না। এটাই ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর শক্ত দলীল। দু'বছর অতিক্রান্ত হলে একদিনে দুধপান বন্ধ করা হলে শিশুর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ছয় মাস পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। পারলে ২ বছরেই বন্ধ করবে। এটা হলো আইনগত দিক। বর্তমানে মায়ের দুধের বিকল্প অনেক দুধ পাওয়া যায়। তাই দু'বছরের মধ্যেই দুধ ছাড়াতে এখন কোন অসুবিধা নেই।

খোলাসা তাফসীর ঃ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, মায়েরা তাদের শিশুকে পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে স্বামীর পক্ষে চাই সে তালাকপ্রাপ্তা হোক না কেন। এই দুধপান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব। পিতার উপর সন্তানের দুধপানের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব- চাই নিজ স্ত্রী দিয়ে হোক, অথবা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী থেকে হোক, অথবা ধাত্রী দিয়ে হোক। দুধপান করানের সময়ে দুধপানকারিণীর যাবতীয় ভরণ–পোষণ পিতার উপর ওয়াজিব। এটা সাধ্যের মধ্যে হতে হবে। শিশুকে দুধপান করানোর জন্য তার মাকে জোর করা যাবে না এবং পিতার উপরও স্ত্রী অতিরিক্ত চাপ দিতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ সাধ্যের অতীত কাউকে কষ্ট চাপিয়ে দেয়ার পক্ষে নন। আর যদি শিশুর পিতা মারা যান তাহলে যিনি ওয়ারিশ হবেন তার উপরই শিশুর লালন পালন করানোর দায়িত্ব বর্তাবে। আর দুধপান করানোর মুদ্দত দু'বছর। কিন্তু স্বামী পরামর্শ করে যদি কিছু পূর্বে বা পরে দুধ ছাড়াতে চায় তাতেও তাদের পাপ হবে না। এটাই হানাফী মাযহাবের অভিমত।

অতঃপর ধাত্রী দিয়ে শিশুকে দুধপান করানোর ক্ষেত্রে স্বামীরা ইচ্ছা করলে ধাত্রী নিয়োগ করতে পারে। এতে স্ত্রীর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় স্থিরকৃত বিনিময় বা প্রচলিত বিনিময় আদায় করে দিলে তাতেও কোন গুনাহ হবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। কোন হিলা বাহানা করে বিনিময় আদায় করতে দেরি করা যাবে না। হালাল মাল দিয়ে সন্তানকে লালন পালন করতে হবে। আর স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ সব কিছু দেখেন। শিশু পালনের যাবতীয় আইন হলো অত্র আয়াত।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

-: যোগাযোগ :-

মোহাম্মদ ফারিজুল বারী
০১৯২১৩০৮০৫৯

মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ
০১৯১১৯৬৪২৮৬

মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী
০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

দরসে হাদীস

নবীজির ইলমে গায়ব

মাওলানা মুহাম্মাদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ» فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا–

অনুবাদ ঃ হযরত আমর ইবনে আখতার রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহন করলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করলেন; এমনকি যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল; এক পর্যায়ে তিনি মিম্বর হতে নেমে এসে যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর আবারো আরোহন করলেন মিম্বরে, আর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন, এমনকি আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হল। অতঃপর মিম্বর হতে নেমে আসরও পড়লেন, পুণরায় মিম্বরে আরোহন করে বক্তব্য দিতে দিতে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল সেদিন নবীজি আমাদের সামনে অতীতে যা কিছু ছিল এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সকল বিষয়ে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যাঁদের স্মরণশক্তি অধিক তারা সে সব (অদৃশ্য) সংবাদ বেশি মনে রাখতে পেরেছেন।

(সূত্র ঃ বোখারী শরীফ হাদীস নম্বর ৬২৩০ কিতাবুল কদর, মুসলিম শরীফ হাদীস নম্বর ২৮৯১ কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী শরীফ হাদীস নম্বর ২১৯১ কিতাবুল ফিতান, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নম্বর ৪২৪ কিতাবুল ফিতান, মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবুল ফিতান ৪৩১ পৃষ্ঠা)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর বুকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সবাইকে তাদের নুবূয়াতের দলিল হিসেবে কিতিপয় মু'জিযা দান করেছেন।

অন্য নবীদের ক্ষেত্রে সে সব মু'জিযার সংখ্যা সীমিত থাকলেও আমাদের প্রিয়রসূল সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য নবীদের যাবতীয় মু'জিযা একত্রিত করলে যা হয়, তার সবক'টি তো বটে, বরং এরপরেও আরো কত মু'জিযা দান করেছেন তা অঙ্কিত করা যাবে এমন হিসেবের খাতা নীল আকাশের নিচে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। গণনার বাইরে যে সব মু'জিযা রয়েছে এর একটি হল ইলমে গায়ব বা অদৃশ্যজ্ঞান। এই ইলমে গায়ব মহানবীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম আর মহান আল্লাহর অনুগ্রহ। যেমন- কোরআনে পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيماً–

অর্থাৎ- "আপনি যা জানতেন তিনি আপনাকে সবই শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা ছিল আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।" (আয়াত নং- ১১৩) পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলা যায়- নবীপাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য মহান আল্লাহ অজানা কিছুই রাখেননি; হোকনা তা অতীত কিংবা ভবিষ্যত কেয়ামত পরবর্তী বেহেশত-দোযখের সংবাদ পর্যন্ত যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারেনি। তাইতো তিনি উপস্থিত অনেক লোকের মনের খবর বলে দিতেন, মুনাফিকদের অন্তরে আবৃত অন্ধকার কুঠুরিতে লালিত কপটতা প্রকাশ করে মসজিদ থেকে তাদের অনেককে বের করে দিতেন। এমন অনেক সাহাবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের

বংশতালিকা নিখুঁতভাবে বলে দেওয়া কি প্রমাণ করেনা নবীজীর ইলমে গায়ব বিতর্কের উর্ধ্বে একটি স্বীকৃত বিষয়। আল্লাহর রসূলের বাল্যবন্ধু নয় কেবল সারাজীবনের একান্ত সঙ্গী ইসলামের প্রথম খলীফা এবং নবীদের পর যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে নবীজীর কাছে তার নুবুয়তের পক্ষে দলীল কী আছে জানতে চাইলে নবীজী উত্তর দিতে গিয়ে ভ্রু কুঁচকে ফেলেছিলেন? না বরং দু'শ ভাগ দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বলে দিয়েছিলেন কেন গত রাতে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ, আকাশের চন্দ্র-সূর্য তোমার কোলে এসে হাজির। আর সিরিয়া যাত্রাপথের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী তোমাকে যা কিছু বলেছে তাই তো আমার নুবুয়াতের পক্ষে দলীল। এমন আশ্চর্য তথ্যপ্রদান শুনে সিদ্দিক্ব-ই আকবর একেবারে স্তম্ভিত! সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল তাঁর !কী আশ্চার্য! যে কথা আমি আর সুদূও সিরিয়ার সেই বৃদ্ধ লোকটি ছাড়া আর কেউ জানার কথা নয়, তার সব ক'টি পরিস্কার করে বলে· দিলেন! এই অদৃশ্যজ্ঞানের সংবাদদাতা (নবী) কস্মিণকালেও মিথ্যা হতে হতে পারেন না। তিনিই মহান আল্লাহর সত্য নবী সন্দেহাতীত ভাবে তা প্রমাণিত।

তদ্রূপ হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথা শোনা যাক। বদরের যুদ্ধের বন্দীদের কে মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ হলে অন্য বন্দীরা যথারীতি মুক্তিপণ আদায়ে ব্যস্ত। এদিকে ভাতিজার কাছে এসে আবেদন করলেন, বাবা! আমিতো গরীব মানুষ। মুক্তিপণ দেয়ার মত আমার কাছে কোন সম্পত্তি নেই। উত্তরে নবীজী বললেন, কেন চাচা! আপনি শুধু শুধু মিথ্যা বলছেন? যুদ্ধে অসার পূর্বে আপনি আমার চাচীর কাছে যে স্বর্ণালস্কার লুকিয়ে রেখে এসেছের সেগুলো কোথায় গেল? আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সে গোপন সংবাদ তো দুনিয়ার বুকে অন্য কেউ জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁর ভাতিজা কীভাবে সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন, তা রীতিমত বিস্ময়ের ! না ! এ ধরনের অদৃশ্য সংবাদদাতা (নবী) কোনদিন মিথ্যা ও ভন্ড হতে পারেন না। তাঁর কপালও চমকে উঠল। নবীজীর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলে উঠলেন হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে ইসলামের কালেমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দিন; আমি এতদিন ছিলাম গভীর অন্ধকারের নিমজ্জিত। এবার আলোতে আসতে চাই। নবীজী তাঁকে কলেমা পড়িয়ে মুসলামান বানালেন। এভাবে আবু বকর মুহূতে বেহেশতী হয়ে গেলেন। শুধু কি তাই নবীর পরশে শ্রেষ্ঠে সোনার মানুষে রূপান্তরিত হলেন। এভাবে হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে যা দ্বারা স্পাষ্ট প্রমানিত হয় মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে ইলমে গায়ব দান করেছেন।

এখন আমরা আরো কয়েটি সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করব, যাতে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানি না বলে যারা গলার পানি শুকিয়ে ফেলে তারাও বিষয়টি সহজে বুঝতে পেরে হিদায়াত লাভ করে।

عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ-

অর্থাৎ-হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন -একদা হুজূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দন্ডায়মান হলেন অতঃপর সৃষ্টিজগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথা বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সবকিছু আমাদের সামনে বলে দিলেন। আমাদের মধ্যে যারা মুখস্থ রাখতে পারে তারা মুখস্থ রেখেছে ;আর যারা ভুলে যাবার তারা ভুলে গেছে।(বুখারীঃ হা.নং ৩০২০ঃ বাবু বাদয়িল খালক্ব।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ»، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ হযরত হুযাইফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন- সেদিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার কোন বিষয়ই তার বক্তব্যে বাদ দেননি। শ্রোতাদের মধ্যে যে মুখস্থ রাখার সে মুখস্থ রেখেছে, আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।(সূত্রঃ বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬২৩০ কিতাবুল কদর, মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২৮৯১ কিতাবুল ফিতন)

হযরত আনাস বিন মালিক রদ্বিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীস শরীফে দেখা যায়, তিনি বলেন- একদা নবীপাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাস আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন তখন সূর্য পশ্চিমাকাশের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল (অর্থাৎ যোহরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল), অতঃপর নবীজী যোহরের নামায পড়লেন আর সালাম ফিরানোর পর মিম্বারে আরোহন করে কেয়ামতের আলোচনা রাখলেন এবং কেয়ামতের পূর্বেকার কতিপয় বড় বড় ঘটনার বর্ণানা দিলেন আর উপস্থিত সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন- কারো কোন বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে সে যেন প্রশ্ন করে। তিনি আরো বলেন -খোদার কসম! তোমরা আমার কাছে যা কিছু জানতে চাইবে আমি এই মজলিসেই সব প্রশ্নের উত্তর দিব।

হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ দৃঢ় মনোবল দেখে আনসারী সাহাবীরা আনন্দেই কান্নার রোল বয়ে দিল। আর নবীজী বারবার বলে যাচ্ছেন- তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর প্রশ্ন কর। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল -হে আল্লাহর রসূল ! পরকালে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? নবীজী বললেন-জাহান্নাম।অতঃপর আবদুল্লাহ বিন হুযাফা বললেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার বাবা কে ? নবীজী বললেন-তোমার বাবা হুযাফা। নবীজী আবারও জোর তাকীদ দিয়ে বললেন, তোমরা প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর। অতঃপর ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর বরাবর সামনে গিয়ে বসলেন আর বললেন-আমরা সন্তুষ্টি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে পেয়ে। তিনি এসব কথা বলার সময় নবীজী চুপ রইলেন অতঃপর বললেন -সেই সত্তার কসম।যার হাতে আমার প্রাণ আমার এই দেয়ালের সামনে এইমাত্র বেহেশত ও দোযখ হাজির করা হয়েছে, যখন আমি নামায পরছিলাম, আজকের মত কোন ভাল-মন্দকেও দেখিনি। (সূত্রঃ- বুখারী শরীফ হাদীস নং-৬৮৬৪ কিতাবু ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৩৫৯)

এভাবে অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়ব'র অধিকারী ছিলেন। অবশ্যই তা আল্লাহ প্রদত্ত। আর সত্তাগত আলিমুল গায়ব হলেন একমাত্র আল্লাহ।আর আল্লাহর রসূলের ইলমে গায়ব আল্লাহ প্রদত্ত।যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ–

অর্থাৎ- "হে সাধারণ লোকগণ! আল্লাহ তা'আলার শান যে, তিনি তোমাদেরকে ইলমে গায়ব দান করবেন, তবে রসূলগণের মধ্য হতে তিনি যাকে চান তাকে অদৃশ্যজ্ঞানের জন্য মনোনীত করেন।"

রসূলদের মধ্য হতে যদি আল্লাহ পাক কাউকে নির্বাচিত করেন, তাহলে সর্ব প্রথমে কাকে নির্বাচিত করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

মূলত গবেষণা করলে দেখা যায়, নবীজীর বর্ণাঢ্য জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে বিশ্বমানবতার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীতে দেখা যায়, ইলমে গায়বের প্রভাব।পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোতে সংক্ষেপে এতটুকু আলোচনা করলাম। বিস্তারিত জানার জন্য দেখতে পারেন জা-আল হক্বঃ প্রথম খন্ড (বাংলা সংস্করণ)।

তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)

মূল ঃ শায়খ কাব্বানী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)
অনুবাদ ঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সময় তাসাউফ ছিল একটি বাস্তাবতা। কিন্তু তার কোন নাম ছিল না। আজকে তাসাউফ হলো একটি নাম, কিন্তু এর বাস্তবতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন।

বর্তমান মুসলিম জাতির জন্য প্রয়োজন এমন সুজ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের- যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুশীলন করেন (আলিম ও আমিল) যুগে যুগে ক্ষয়ে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধ ও সভ্যতা সংস্কৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যারা সাধ্যানুযায়া সচেষ্ট এবং যারা হক (সত্য) ও বাতেলের (মিথ্যার) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, আর যারা হক্ক এ বিশ্বাস করেন ও বাতেলের বিরুদ্ধাচারণ করেন আল্লাহর পথে তারা কাউকে ভয় করেনা।

আজকের মুসলমান সমাজকে সত্য ও সঠিক পথের দিকে, ধর্মের শিক্ষার দিকে পরিচালনা করার মতো আলেমের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে। পক্ষান্তরে আমর এমন কিছু আলেমের দেখা পাই - যারা ইসলাম সম্পকে জানার ভান করেন, অথচ ইসলামের নামে সবার ওপর নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় রত থাকেন। তারা সকল সভা সমিতি ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এরায় নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে ইলাম ধর্ম সম্পর্কে লেকচার ও বয়ান দেন। এ ধরনের বক্তব্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর সাহাবীদের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ইসলামের মহান ইমামদের সাথেও নয়, অধিকাংশ মুসলমানদের ঐকমত্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আলেম উলামা যদি নিজের বিবেকের কথা শুনতেন ও ইসলামের প্রতি অনুগত ও নিষ্টাবান হতেন, আর অর্থের জোরে মুসলমান দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকার ও শক্তিগুলোর প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধু দাওয়াত ও ইরশাদের (প্রচার) কাজে নিয়োজিত হতেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মরণে মশগুল থাকতেন, তাহলে ইসলামী বিশ্বের পরিস্থিতি ও চেহারা পাল্টে যেতো এবং মুসলমানদেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হতে। আমরা আশা করবো, মহানবীর সুন্নাহ ও শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে সারা বিশ্বের মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আকড়ে ধরবেন।

ইতিহাসকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, সাহাবায়ে কেরামের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার (দাওয়াত ও ইরশাদ) ঘটেছিল তাসাউফ (সূফীবাদ)-এর জ্ঞানী বুযুর্গানে দ্বীন ও তাঁদের অনুসারীদের মাধ্যমে - যারা মহানবীর খলিফাবৃন্দের সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন। তারা প্রকৃত সূফীবাদের আলেম ছিলেন - যে সূফী মতবাদ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাসমূহ সমুন্নত রেখেছে এবং তা থেকে বিচ্যুত হয় নি।

ইসলামী যুহদ (কৃচছতা সাধন) প্রথম হিজরী শতকে বিকশিত হয়ে গেল এবং বিভিন্ন তরীকায় পরিনত হয়েছিল। এসব তরীকার ভিত্তি ছিল কুরঅন ও হাদীসের শিক্ষা এবং এগুলো প্রচার করতেন যাহেদ উলামায়ে কেরাম - যারা পরবর্তীকালে সূফী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম চার ইমাম যথা- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), আরও রয়েছেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আল বুখারী (রহঃ), আবুল হুসাইন মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ (রহঃ), আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) প্রমুখ। অতঃ পর যারা আগমন

করেছেন- তাদের মধ্যে রয়েছেন-ইমাম হাসান আল বসরী (রহঃ), শায়খ জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ), ইমাম আওযায়ী (রহঃ) এদের পরে এসেছেন আত তাব্‌রানী (রহঃ) ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), ইবনে হাজর আল হায়তামী (রহঃ), আল জর্দানী, আল জওযী, ইমাম মহিইদ্দীন বিন শারফ বিন মারী বিন হাসান বিন হুসাইন বিন হাযম বিন নব্বী (রহঃ), ইমাম আবু হামিদ গাযালী (রহঃ), সৈয়দ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী- প্রমূখ। এসব যাহেদ আলেম তাদের আনুগত্য, নিষ্ঠা ও অন্তরের পরিশুদ্ধির কারণে সূফী হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন এবং তাদের চেষ্টার ফলেই মুসলিম বিশ্ব আজ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

আমরা এ তথ্যটি গোপন করতে চাই না যে, ঐ সময় কিছু ইসলামের শত্রু সীমা লংঘন করে সূফীবাদের নামে ও সূফী হবার ভান করে প্রকৃত সূফী দর্শনকে ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের মনকে সূফী দর্শনের প্রতি তিক্ত করার লক্ষ্যে নিজেদের মনগড়া মতবাদ পরিবেশন করেছিল। উল্লেখ্য যে, ওই সময় সূফী মতবদ মসলমানদের মধ্যে মুলধারা ছিল। প্রকৃত তাসাউফ যুহদ ও এহসান (অন্তরের পরিত্রতা) এর উপর ভিত্তিশীল। মুসলিম বিশ্বের মহান ইমামবৃন্দ যাদেরকে সকল মুসলমান দেশে অনুসরণ করা হতো, তারা সূফী গুরু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম আবু হানিফা (যার শিক্ষক ছিলেন ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল যার মুরশিদ ছিলেন বিশর আল হাফী) সকলেই তাসাউফকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

মুসলমান দেশেগুলোর সকল বিচারালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি এই চার ইমামের মযহাব গুলোর শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ, মিসর, লেবানন, জর্দান, ইয়েমেন, জিবুতি ও আরো কিছু দেশ শাফেয়ী মাযহাব অনুসরণ করে। সুদান, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া ও সোমালিয়া মালেকী মযহাবের অনুসারী। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান, এবং আরো কিছু দেশ হাম্বলী মযহাব অনুসরণ করে। তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, এবং মধ্য এশিয়ার কিছু মুসলমান প্রজাতন্ত্রের দেশে হানাফী মযহাব অনুসরণ করা হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলমান দেশগুলোর বিচারালয়ের অধিকাংশই এই চার মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী চলে। আর এই চার মযহাবের সবগুলোই তাসাউফকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

ইমাম মালেক (রহ:) এর একটি বিখ্যাত বাণী আছে, তিনি বলেন "মান তাসাওয়াফা ওয়ালাম ইয়াতাফাক্বাহা- ফাকাদ তাযানদাক্বা ওয়ামান তাফাক্বাহা ওয়ালাম ইয়াতা সাওয়াফ ফাকাদ তাফাসাক্বা, ওয়ামান তাসাওয়াফা ওয়া তাফাক্বাহা ফাকাদ তাহাক্বাকা"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফেকাহ ছাড়া তাসাইফ শিক্ষা করে সে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়, আর যে ব্যক্তি তাসাউফ বাদ দিয়ে ফেকাহ শিক্ষা করে, সে ফাসিক গুনাহগার হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তাসাউফ ফেকাহ দুটোই শিক্ষা করে, সে সত্য ও ইসলামের বাস্তবতাকে খুজে পায়।

এমন করা যখন কঠিন ছিল - এমনি এক সময়ে ইসলাম ধর্ম সূফী পর্যটকদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় দ্রুত প্রসার লাভ করে, এই সূফীবৃন্দ এতো মহান কাজের জন্যে আল্লাহর পছন্দকৃত বান্দা হবার শর্ত যুহদ আদ দুনইয়া (কৃচ্ছকৃত) তে সুশিক্ষাত হয়ে গড়ে উঠেছিল। তাদের জীবনই ছিল দাওয়াত, আর তাদের খাদ্য ছিল রুটি ও পানি। তাদের এই সংযম দ্বারা ইসলামের অশীবাদে তারা পশ্চিম থেকে দূর প্রাচ্যে পৌছে ছিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দিতে সূফীগুরুদের প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ফলে তাসউফ ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। প্রতিটি সূফী তরীকা তার মুরশিদের নামে পরিচিত লাভ করে - যাতে করে অন্যান্য তরীকা থেকে তাকে পৃথক ভাবে চেনা যায়। একইভাবে আজকে প্রত্যেক ব্যক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী

লাভ করেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিজ নামের সাথে বহন করেন। এটা নিশ্চিত যে সূফী পীরে কখনো পরিবর্তিত হয় না, ঠিক যেমন ইসলাম এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তিত হয় না।

তবে, অতীতে শিক্ষার্থীরা (মুরিদরা) তাদের পীরের উন্নত নৈতিকতা ও আচার ব্যবহারে প্রভাবিত হতেন সে কারণে তারা একনিষ্ঠ ও অনুগত ছিলেন। কিন্তু আজকে আমাদের আলেম উলামা সেই ধরনের দিক নির্দেশনা দিতে অক্ষম এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে লিখতে হচ্ছে অমুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, অমুসলিম শিক্ষকদের কাছ থেকে।

সূফীগুরুগণ তাদের মুরিদদেরকে বলতেন- আল্লাহ তায়ালাকে স্রষ্টা হিসেবে এবং তাঁর রাসূলকে তাঁরই হাবীব ও নবী হিসেবে গ্রহণ করতে। আরও নির্দেশ দিতেন একমাত্র আল্লাহ তালার এবাদত করতে এবং মূর্তিপূজা পরিহার করতে, খোদার কাছে তওবা করতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে, নিজেদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে এবং আল্লাহর একত্বে তাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে। মুরিদবৃন্দকে তারা শিক্ষা দিয়েছিলেন- যাতে সকল কাজে তারা সৎ ও আস্থাবাজন হন, আর ধৈর্যশীল ও খোদাকে ভয়কারী হন, যাতে তারা খোদার উপর নির্ভর করেন এবং সকল সৎ গুণাবলীর অধিকারী হন, যা ইসলাম দাবি করে। উন্নত চরিত্রই সাফল্যের চাবি কাঠি।

আন্তরিকতা ও পবিত্রতার এসব মকাম অর্জনের উদ্দেশ্যে সূফীপীরবৃন্দ তাদের মুরিদদেরকে বিভিন্ন দোয়া কালাম শিখিয়ে ছিলেন- যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাহাবায়ে কেরাম 'ও তাবেয়ীনবৃন্দের আমল ছিল। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যিকরুল্লাহ-তথা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন পাঠের মাধ্যমে, দোয়া ও তাসবীহ হাদীস শরীফ হতে, আর আল্লাহর নাম ও তামজীদ -এর মাধ্যমে তারা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এগুলো যিকর সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত (সহীহ বুখারী, মুসলিম, তাবরানী, ইবনে মাজাহ, আবু দঠফদ উত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে "ইসলামে যিকর" শীর্ষক অধ্যায়ে এগুলো পাওয়া যায়)।

এ সকল সূফী মুরশিদ (প্রকৃত আলেম উলামা) খ্যাতি ও উচ্চপদ, অর্থবিত্ত ও বস্তুবাদী জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা আমাদের যমানার আলেম উলামার মত ছিলেন না, যারা যশ প্রতিপত্তি ও অর্থ বিত্তের পেছনে ছুটছেন। বরং তারা ছিলেন দুনিয়াত্যাগী যাহেদ ও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, যেমনি ভাবে কুরআনে তিনি আদেশ করেছেন্ মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনশা ইল্লা লি ইয়া 'বুদুন। অর্থাৎ আমি জ্বিন ও ইহসান (মানব) জাতি দুটোকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার এবাদত করার উদ্দেশ্যে।

সূফীবৃন্দের শিষ্টাচার ও যুহদের ফলে তারা ধনাঢ্য ব্যাক্তিদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা মুসলিম জাহনে মসজিদ ও খানাকাহ ও মসজিদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম একদেশ থেকে আরেক দেশে প্রসার লাভ করে।এসব আশ্রয়কেন্দ্র যেখানে ছিল গরিবদের অন্তরের জন্যে নিরাময় স্বরূপ। সেগুলো আরও ছিল ধনী ও গরিবের সাদা ও কালো, হলুদ ও লাল বর্ণের মানুষের, আরব ও অনারবের সম্পর্কে সুদৃঢ় করার এবং একাত্ম হবার স্থান।

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে এরশাদ ফরমান- "আরব ও অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধু হক - তথা সত্য ও ন্যায় দ্বারাই পার্থক্য করা হবে।

এ সকল খানাকাহ পৃথিবীর সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর মানুষের জন্যে সম্মেলনস্থলে পরিণত হয়। সূফীবৃন্দ সুন্নাহ ও শরীয়তকে সমুন্নত রেখেছিলেন। তাদের ইতিহাস হলো আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ) করার সাহসিকতার ভরা, নিজেদের দেশ ছেড়ে মানুষের মন জয় করার ও ভালবাসা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আনার সংগ্রাম। তারা জাতি -গোষ্ঠী ও নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে

ভালবেসে ছিলেন। তারা সবাইকে সম্মান করেছেন, বিশেষ করে অবহেলিত নারী সমাজ ও গরিব দুঃস্থ মানুষকে। সূফীবৃন্দ ছিলেন পৃথিবীতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, সর্বত্র দেদীপ্যমান। তাঁরা সবাইকে জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহ -তথা আল্লাহর রাস্তায় কঠিন সাধনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন, ইসলাম প্রচার প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, গরিবদেরকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। তারা ঈমানী দাওয়াত পৌছে দিয়েছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে ভারত, পাকিস্তান, তাশখন্দ, বোখরা, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া মতো অন্যান্য অঞ্চলে। প্রকৃত সূফীবৃন্দ কখনোই নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়ত ও সুন্নাত থেকে এবং কুরআন মজীদ থেকে বিচ্যুত হন নি, যদিও কিছু সূফী জযবা হালতে তথা ঐশী ভাবোন্নত অবস্থায় কিছু উক্তি করেছেন এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাসাউফের প্রধান বা মূল দুটি উৎস ছিল কুরআন মজীদ ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ, যা সাইয়্যেদুন্না হযরত আবু বকর (রাঃ) ও সাইয়্যেদুনা হযরত আলী (রাঃ) এর ইসলাম উপলব্ধির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। এই দু'জন সাহাবীকে সূফী তরিকাহ সমূহের উৎস - মূল বিবেচনা করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাসাউফের একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মা সাব্বাল্লাহু ফী সাদরী শাইয়ান - ইল্লা ওয়া সাব্বাবতুহু ফী সাদরি আবি বাকরিন"। অর্থাৎ "আল্লাহ পাক যা কিছু আমার অন্তরে ঢেলেছেন- তার সবই আমি আবু বকরের (রাঃ) অন্তরে ঢেলেছি" (হাদিকাতুন নদীয়া, কায়রো হতে প্রকাশিত, ১৩১৩হিজরী, পৃষ্ঠা- ৯)। আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে এরশাদ ফরমান- "তবে নিশ্চয় আল্লহ তাকে (নবী করিম) সাহায্য করেছেন। যখন কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে, একজন ছাড়া তার আর কোনো সঙ্গী ছিল না - তারা দুজনই গুহার মধ্যে ছিলেন"। (সুরা তাওবা - ৪০ নং আয়াত)

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান - "খাস্যিয়া (আঃ) ছাড়া আবু বকরের (রাঃ) মতো আর কারো উপর সূর্য এমন ভাবে উদিত হয়নি।(ইমাম সুয়ুতী রচিত খলিফাদের ইতিহাস, কায়রো, ১৯৫২, পৃষ্ঠা - ৪৬)।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মকাম (মর্যাদা) ব্যাখ্যাকারী আরও অনেক হাদীস আছে। তাসাউফের অপর ধারাটি সাইয়্যেদুনা হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে এসেছে, তার সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে- যা ব্যাখ্যা করতে অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় হবে। পরিশেষে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত ও শরীয়ত যা ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ও এহসান (আধ্যাত্মিকত) এর প্রতিনিধিত্ব করে, তা সূফী বুযূর্গদেও চরিত্রে মুর্ত প্রকাশিত ছিল।

হিজরী ১৩ শতাব্দীতে একটি নতুন গোষ্ঠীর (ওহাবী) আবির্ভাব ঘটে- যারা ৭ম হিজরীর দুজন আলেমের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেল। এরা নিজেদের কে হাম্বলী মযহাবের অনুয়ারী দাবি করলেও তাদের আকিদা বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা তাসাউফ সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং চার মাযহাব থেকে বিচ্যুত হয়। (এরা ছিল ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়েম)।

সাম্প্রতিক কালে ঐ নতুন গোষ্ঠীর অনুসারীরা সীমা লংঘন করে তাদের আধুনিক যুগের গুরুদের (বিন বাজ ও আলবানী) ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করছে। এইসব গোষ্ঠী প্রধান নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ফতোয়া প্রদান করে মুসলামনদের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বর্তমানে এরাই সূফীতত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছে এবং বিগত ১৩০০ বছর যাবত ইসলাম প্রচার প্রসারে সূফীদের সমস্ত অবদানকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে।

আমাদের মুসলমান ভাই-বোনদের জ্ঞাতার্থে আমরা বিভিন্ন মুসলিম দেশের অগনিত সূফী তাত্ত্বিকদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

১। মিসরীয় মুফতী হাসসানাইন মোহাম্মদ আল মুখলুখ, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সদস্য।

২। মোহাম্মদ আত তাইয়েব আন নাজ্জার, সুন্নাত এন্ড শরীয়াহ ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি এবং আল আযহার বিশ্ববিদ্যায়ের সভাপতি।

৩। শায়খ আব্দুল্লাহ কানুন আল হাসসানী, মরক্কোর উলামা সংস্থা প্রধান এবং ওয়ার্ল্ড ইসলামিক লীগের ডেপুটি।

৪। ড. হুসাইনী হাশিম, মিসর আল আযহারের ডেপুটি এবং মক্কার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের মহাসচিব।

৫। সাইয়্যেদ হাশিম আল রেফাঈ, কুয়েত সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী।

৬। শায়খ সাইয়্যেদ আহমদ আল আওয়াদ, সুদানের মুফতী।

৭। উস্তায আবদুল গফুর আল আত্তার, সৌদি আরব লেখক সমাজের সভাপতি।

৮। কাযী ইউসুফ বিন আহমদ আস সিদ্দিকী, বাহরাইনী হাই কোর্টের জজ।

৯। মোহাম্মদ খাযরাজী, শায়খ আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন যাবারা, ইয়েমেনের মুফতী।

১০। শায়খ মোহাম্মদ শাধিলী নিভার, তিউনিশিয়ার শরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট।

১১। শায়খ খাল আল বানানী, মৌরিতানিয়ার ইসলামিক লীগের সভাপতি।

১২। শায়খ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ আহমদ, মিসরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী।

১৩। শায়খ মোহাম্মদ বিন আলী হাবশী, ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক লীগ সভাপতি।

১৪। শায়খ আহমদ কোফতারো, সিরিয়ার মুফতী।

১৫। শায়খ আবু সালেহ মোহাম্মদ আল ফাততিহ আল মালেকী, ওনদুরমান, সুদান।

১৬। শায়খ মোহাম্মদ রাশিদ কাব্বানী, লেবাননের মুফতী।

১৭। শায়খ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মালেকী আলভী আল হাসানী, শরীয়ার অধ্যাপক এবং মক্কা ও মদীনার দুটো পবিত্র মসজিদেও শিক্ষক, (বর্তমানে ইনতিকাল প্রাপ্ত)।

এবং আরো অগনিত সূফীবাদী হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

ওহে আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা ! ইসলাম হলো সহিষ্ণুতা (হিলম), ভালবাসা, শান্তি। ইসলাম হলো বিনয়, পূর্ণতা। ইসলাম হলো যুহ্দ, এহসান। ইসলাম মানে সুসম্পর্ক। ইসলাম মানে পরিবার, ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম মানে সাম্য।

ইসলাম হলো জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা। ইসলামের যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) জ্ঞান রয়েছে। ইসলামের অপর নাম বেলায়াত ও সূফীবাদ, আর বেলায়াত ও সূফীবাদই হলো ইসলাম।

পরিশেষে বলবো- ইসলাম ধর্ম হলো আমাদের প্রতি আল্লাহ তালার প্রেরিত আলো- যা তিনি সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ভালবাসার ও যাহেরী বাতেনী জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক, সকল মানবের জন্যে তিনি করুনার প্রতীক। তিনি খোদার সাথে আমাদের মধ্যস্থতাকারী, সবার জন্যে তিনি শাফায়াতকারী - যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ লেখায় ভুলত্রুটি হলে মাফ করুন, আমিন।

এ লেখাটি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধ লেখক ঐ ফাউন্ডেশনের সভাপতি।

খারেজী ও রাফেযী ঃ একটি পর্যালোচনা

মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন। ইসলামের দাবি ও আবেদন বিশ্বজনীন সার্বজনীন। মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম ইসলামের অভ্রান্ত দলীল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ তথা হাদীস শরীফ ইসলামের শাশ্বত নির্ভুল নির্দেশনা, কোরআন সুন্নাহ ইজমা ক্বিয়াস এর সমষ্টি দলীল চতুষ্টয় বিশ্বমানবতার মুক্তির অবলম্বন। ইসলামের পূর্ণতায় বিশ্বাসী মুসলিম মাত্রই উপরোল্লিখিত বিধানাবলীর অনুসারী। কিন্তু ইসলামের ছদ্মাবরণে যুগে যুগে আবির্ভুত হয়েছে অসংখ্য ভ্রান্ত দল উপদলের। ইসলামের স্বচ্ছ সুন্দর নির্মল আদর্শকে কালিমাযুক্ত করার হীন প্রয়াসে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদের। শিরোনামে উল্লিখিত খারেজী ও রাফেযী সম্প্রদায় দুটি ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল মতবাদ। তাদের আক্বীদা বিশ্বাস ও কর্মনীতির কারনে তাদের ভ্রান্তি ও কুফরী চিহ্নিত। ইতিহাসে তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কোরআন সুন্নাহ ও ইসলামী গবেষক ইমাম মুজতাহিদ পন্ডিত মনীষীদের গবেষণা ও মতামত পর্যালোচনার নিরিখে খারেজী রাফেযী ভ্রান্ত মতবাদ দুটির প্রকৃত পরিচয় তাদের আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্তনীতি পাঠক সমাজে তুলে ধরার মানসে আমার এ সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

খারেজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খারেজী শব্দের অর্থ দলত্যাগী। সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দলত্যাগ করে চরমনীতি অনুসরণ পূর্বক যে বার হাজার মুসলমান এক নতুন দল গঠন করেছিল ইতিহাসে তারা খারেজী নামে অভিহিত।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষত্যাগকারী খারেজীরা কুফার হারুরা নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকে। এ কারণে হাদীস শরীফে খারেজীদেরকে হারুরীয়া নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

খারেজীরা তাদেরকে আল্লাহর পথে বহির্গত (খারিজ) বলে মনে করত। পক্ষান্তরে মুসলমানরা খারেজীদের উগ্রভাবধারা ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যাবলীর কারণে তাদেরকে ইসলামের সীমারেখা হতে বহির্গত মনে করত এ কারণে তারা মুসলিম সমাজে খারেজীরূপে আখ্যায়িত।

খারেজীদের উৎপত্তি

মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে খলীফা নির্বাচন বিষয়টি কেন্দ্র করে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ কেউ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর নির্বাচিত খলীফা মনে করতেন। মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন। তাই তিনিই যথার্থ উত্তরসূরি এ যুক্তিও অনেকের। পরবর্তীতে সকল কল্পনা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কোরাইশ থেকে খলীফা হবেন। তদুপরি হুযুরের পর সর্বাধিক যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামি জগতের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। পর্যায়ক্রমে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও উমাইয়া বংশের হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১২ বৎসর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর মুনাফিক সাবায়ীদের চক্রান্তে সৃষ্ট বিদ্রোহের এক পর্যায়ে কয়েকজন আততায়ীর তরবারীর আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এরপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খলীফাপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি প্রতিটি প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কিছু সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন। সিরিয়া প্রদেশের গভর্নর হযরত আমীর-ই

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট প্রথমে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হত্যাকারীদের বিচার করার দাবি করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রকৃত অপরাধীদের খুজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য তদন্তটিম গঠন করে অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনযোগী হন। কিন্তু প্রতি পক্ষরা তাঁকে সময় দিতে সম্মত হননি। এর ফলে নতুন নতুন রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হতে লাগল। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হত্যার ঘটনার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নেতৃত্বে যুদ্ধ সংঘটিত হল। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উটের উপর আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হওয়ার কারণে এ যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ। উল্লেখ্য, এক শেণীর লোক দীর্ঘদিন যাবত রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুযোগ সন্ধানে ছিল। হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বিরোধ বিশেষ করে সিফফীনের যুদ্ধ থেকে তারা তাদের কাঙ্খিত স্বার্থ সিদ্ধর স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু যখন দেখলেন যে, সিফফীনের যুদ্ধের যে ভাবেই হোক, একটা মীমাংসা হতে যাচ্ছিল, তখন তারা পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারক নিয়োগ করাকে যেভাবে শির্ক ফতোয়া দিয়ে ওই মীমাংসার চরম বিরোধিতা করে। তাদের বিতর্কিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুমিকা পালনের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের দল থেকে বের হয়ে গেলো। তাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার। এক পর্যায়ে ঐতিহাসিক সিফফীনের যুদ্ধেও দুঃখজনক ফলাফলের ভিত্তিতে তদানীন্তন মুসলিমী খিলাফত দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ইসলামের ইতিহাসে এরাই খারেজী নামে পরিচিত।

হাদীস শরীফের আলোকে বাতিল ফিরকার পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে খারেজী সম্প্রদায় হচ্ছে সর্বপ্রথম বাতিল ফিরকা। সিহাহ সিত্তা তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস শরীফের গ্রন্থসমূহে খারেজীদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামের ছদ্মাবরণে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার উদ্ভব হয়েছে। তাদের কিছু কিছু আক্বীদা বিশ্বাস ও চরিত্রের সাথে খারেজীদের সাদৃশ্য রয়েছে। পাঠক, সমাজের জ্ঞাতার্থে খারেজী সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন বাতিল ফিরকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হল-

১। বিশ্ব বিখ্যাত সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ গ্রন্থ বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে হযরত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বাতিল সম্প্রদায় খারেজী ও মুলহীদদের হত্যা করার বিধান সম্বলিত বাবু কিতালিল খাওয়ারিজ ওয়াল মুলহিদীন পরিচ্ছেদ খারেজী ও মুলহীদদেরকে কতল করা শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ নির্ণয় করেন। উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি নিম্মোক্ত হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে করতেন খারেজীরা আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ প্রিয়নবী হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরকা সৃষ্টি হবে। এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যারা সুন্দর ও ভাল কথা বলবে, আর কাজ করবে মন্দ। তারা কোরআন পাঠ করবে, তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তারা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। অথচ তীর ফিরে আসা সম্ভব। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদাত বরণ করবে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব কোরআন এর প্রতি আহ্বান করবে, অথচ তারা বিন্দুমাত্র আমার অনুসারী নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়বে, সে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহ তাআলার নিকবর্তী অতি নিকটতম হবে. সাহবা-ই কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের চিহ্ন কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, অধিকহারে মাথা মুন্ডানো।

৩। মিশকাত শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামএর নিকট ছিলাম। তিনি গনীমতের মালপত্র বন্টন করছিলেন। তখন হুযুর এ আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বনী তামীম গোত্রের যুলখোয়াইসারা নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইনসাফ করুন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার ধ্বংস হোক! আমি যদি ইনসাফ না করি কে ইনসাফ করবে? যদি আমি ইনসাফ না করতাম তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করি। অতঃপর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার এমন এমন অনুসারী আছে তোমাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় হীন মনে করবে। অনুরূপ নিজের রোযাকে তার রোযার তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। তারা কোরআন পাঠ করবে, কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম হতে এমনিভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়।

৪। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বিভিন্ন সহীহ্ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন অর্থাৎ শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগন করবে যারা বয়সে তরুন এবং তাদের ভেদ জ্ঞান হবে অপরিপক্কতা, বোকামী ও প্রাগলভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা বলবে। সত্য ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু সত্য ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি তীব্রবেগে ছিটকে বেরিয়ে যাবে যেমন করে তীর ধনুক থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখনই তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।

খারেজীদের অদূরদর্শীতা উগ্রভাবধারা চরমপন্থা অবলম্বন অপরিপক্ক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অভাব জ্ঞানবুদ্ধির অহঙ্কার তাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল। বর্ণিত সূত্রে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০ টি পৃথক পৃথক সূত্রে হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে এ সব হাদীস শরীফ প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা সত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সব হাদীস যদিও সার্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে তবে সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ একমত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারেজীদেও আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।

৫। খারেজীগণ জাহান্নামের কুকুর সমতুল্য।

৬। তারা সর্বদা কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে।

৭। তারা অধিক ইবাদত করবে।

৮। তারা ঘন ঘন মাথা মুন্ডাবে।

৯। তারা সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট।

১০। আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তিগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

খারেজীদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ

১। খারেজীরা খোলাফা ই রাশিদীনের দু খলীফা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা

আনহুকে খলীফা হিসেবে স্বীকার করে না।

২। খারেজীদের মতে যে মুসলমান নামায পড়ে না, রোযা রাখেনা সে কাফির।

৩। খারেজীদের মতে একটি মাত্র অপরাধের জন্য যে কোন লোক ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৪। খলীফা বা ইমাম ভুল করলে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে হত্যা করত হবে।

৫। খারেজীরা তাদের বিরুবাদীদেরকে কাফির মনে করে।

৬। ঋতুস্রাবকালীন মেয়েদের উপরও নামায পড়া ফরজ।

৭। যে কোন প্রকার কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি কাফির।

৮। চোরের হাত বগল পর্যন্ত কর্তন করতে হবে।

৯। খারেজীদের মতে সূরা ইউসুফ কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১০। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। যদিও কুফরী পোষণ করে।

১১। তাদের মতে পাপীকে শাস্তি প্রদান করতে হবে।

১২। খারেজীরা উমাইয়া খেলাফতের বিরোধী এবং তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করে।

১৩। খারেজীদের মতে কোন মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির হয়ে যায়।

১৪। খারেজীগণ জিহাদকে ইসলামের মূলভিত্তি বা রুকন মনে করে। তারা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের সাথে জিহাদকেও ষষ্ঠস্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করেছে।

১৫। খারেজীদের মতে খলীফা হওয়ার জন্য কোন গোত্র বা পরিবারের প্রয়োজন নেই। মুসলিম সমাজের যে কেউ খলীফা হতে পারেন।

১৬। তাদের মতে কোন প্রকার ত্রুটির কারণে খলীফা অপসারণযোগ্য ও হত্যাযোগ্য।

১৭।খারেজীরা নিজেদের বাইরে অন্য কারো সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী নয়।

১৮। খারেজীদের মতে তারা নিজেরাই আল্লাহর পথের যাত্রী তাদের সাথে যারা আল্লাহর পথে বের হয়না তারা কাফির।

১৯। তাদের মতে কাফিরদের সন্তানাদি তাদেরপিতামাতার সাথে দোযখের আগুনে জ্বলবে।

২০। খারেজীদের মতে কোরআন আক্ষরিক অর্থেই বুঝতে হবে, রূপক অর্থে নয়।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৫-২০১৬ ইং সেশনে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৫ বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।

[২০১৫ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

দেশ ও জাতির সৌভাগ্যের অনন্য প্রতীক
হযরত শাহ্ জালাল মুজার্‌রাদ ইয়ামেনী (রাঃ)

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

জন্ম ও শৈশব

বিশ্ব বিখ্যাত সূফী পরিব্রাজক ইবনে বতুতার সফরনামা অনুসারে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহির জন্ম ৫৯৬/৫৯৮ হিজরি সনে। তিনি আরবের ইয়ামেনে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম সুলতান হুসাইন শাহ (৯১৮হি./১৫১২ খ্রি) আমলের শিলালিপি অনুসারে মুহাম্মদ। (শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে- In the honour of the greatness of the respected Shikhul Mashaaikh Makhdoom Shaikh Jalal Muzarrad san of Muhammad. অবশ্য কোন কোন জীবনীগ্রন্থে তাঁর পিতার নাম মাহমূদ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর পিতা ছিলেন কোরাঈশ বংশীয় আর মাতা ছিলেন সাইয়্যেদ বংশীয়া। তাঁর পিতা ও পিতামহ (মতান্তরে মাহমূদ) খাঁটি ঈমানদার ও ইসলামের একনিষ্ঠ খাদিম ছিলেন। তাঁর পিতা এক ধমীয় যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন তিন মাসেরও কম, তখন তাঁর মহিয়সী মাতাও ইন্তিকাল করেন। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর মামা শায়খ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দিয়া ত্বরীকার প্রখ্যাত বুযুর্গ ও যুগবরেন্য আলিম ছিলেন। তিনি হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর মায়ের ইন্তিকালের পর তাঁকে নিজ ঘরে নিয়ে যান এবং লালন পালন করেন। তাঁর শিক্ষা দিক্ষার ভারও তিনি গ্রহণ করেন এমনকি তাকে নিজের মত করে গড়ে তোলার প্রতি নজর দেন। সুতরাং এ বুযুর্গ মামার তত্ত্বাবধানে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি কোরআন হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নির্ধারিত সময়ে কিতাবাদি পাঠ করে অবশিষ্ট সময় ইবাদত রিয়াযতে অতিবাহিত করতেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর ধমনীতে পুণ্যাত্মাদের রক্ত, বুযুর্গ মামার নেক দৃষ্টি তদুপরি কঠোর পরিশ্রম এ তিনের সমন্বয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যে হযরত শাহ জালাল এক যুগশ্রেষ্ঠ আলিম মারিফাতের উচ্চতর সোপানে পৌছতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর মামার তত্ত্বাবধানে থেকে একটানা ত্রিশ বছর যাবৎ সাধনা করে বেলায়তের এ উচ্চতর সোপানে উন্নীত হয়েছিলেন।

মুজাররাদ

হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুজাররাদ। এটাআরবি শব্দ। এর অর্থ চিরকুমার ও স্বতন্ত্র। দুকারণে তিনি এ গুণবাচক নামে প্রসিদ্ধ হন

১। এ মহান ওলী শৈশব থেকেই আল্লাহমুখী। আধ্যাত্মিক সাধনায় এতই বিভোর থাকতেন যে, তিনি দুনিয়ার সাথে সংশ্রব রাখতেন না। এমনকি যৌবনে পদার্পণ করেও বিয়ে শাদী করাতো দূরের কথা, কোন নারীর দিকে ভ্রুক্ষেপও করেন নি।

২। তাঁর সমসাময়িক কালে জালাল নামের আরো কতিপয় প্রসিদ্ধ ওলী বুযুর্গ ছিলেন। যেমন শাহ জালাল বোখারী, শাহ জালাল তাবরিযী, শাহ জালাল

গঞ্জে রাওয়া-গঞ্জে বখশ এবং শাহ জালাল জাহানিয়া প্রমুখ। সুতরাং হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি নামের সাথে মুজাররাদ সংযোজন করে তাঁর কথা স্বতন্ত্রভাবে বুঝানো হত।

ইসলাম প্রচারে বের হবার নির্দেশপ্রাপ্তি ঃ-

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবনের প্রাথমিক সোপানে হযরত শাহ জালালতার মামা হযরত আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি নিকট রয়ে লেখাপড়া আধ্যাত্মিক সাধনায় রত ছিলেন। ইত্যবসরেএকদিন হযরত আহমদ কবীর হুজুরাতে উপবিষ্ঠ ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি হরিণী এসে তাঁকে অভিগোগ করল একটি বাঘ তার শাবককে শিকার করে নিয়ে গেছে সে তার বিচার চায় এবং শাবককে উদ্ধারের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল, তিনি ওই হরিণীর কান্না ও আকুল আবেদন শুনে মর্মাহত ও দয়াপরবশ হলেন। তিনি এর প্রতিকারের ভার হযরত শাহ জালালকে অর্পণ করলেন। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি হরিণীকে সাথে নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, হরিণীর শাবককে সামনে নিয়ে বাঘ তখনো বসা আছে। তাঁকে দেখে বাঘ তৎখনাৎ বশ্যতা স্বীকার করে বিড়ালের মত বিনয় প্রকাশ করল।হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি দেখলেন যে বাঘটি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হয়েই হরিণী শাবককে শিকার করেছে। তাই তাকে মেরে ফেলা ঠিক হবে না বরং শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়াই সমীচীন হবে। সুতরাং তিনি তাঁর ডান হাতের তিন আঙ্গুল এবং বাম হাতের দু আঙ্গুল দিয়ে বাঘের মুখে চপেটাঘাত করে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিলেন এবং হরিণী শাবককে উদ্ধার করলেন। আর হুজুরা শরীফে ফিরে এসে মামা হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি কে ঘটনা শুনালেন। এত তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর প্রশংসা করলেন। আর বললেন এখন তোমাকে হুজুরায় আটকে রাখা ঠিক হবে না। সুতরাং তিনি তাঁকে বিভিন্ন দেশ বিশেষ করেভারতে গিয়ে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি স্বপ্নযোগেও ভারতের পূর্ববঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য ওই নির্দেশ শেষ পর্যন্ত সিলেটকে কেন্দ্র করেই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

ইয়ামেন ত্যাগ ও ভারতের দিকে রওয়ানা

হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এতদিন যাকে নিজ তত্ত্বধানে রেখে অদৃশ্য বেলায়তী শক্তির আধার হিসেবে গড়ে তুলেছেন তাঁকে আপন হুজুরা থেকে এক শুভ দিনে ইসলাম প্রচারের জন্যই বিদায় দিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে আপন হুজুরা শরীফ থেকে এক মুষ্ঠি মাটি দিয়ে বললেন এ মাটির সাথে যে জায়গার মাটির রং, রূপ ও স্বাধ মিলে যাবে সেখানেই মাটিগুলো নিক্ষেপ করে বসতি স্থাপন করবে। সুতরাং হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি আপন মুর্শিদ ও মামার নির্দেশ অনুসারে মাত্র ১২ জন মুরীদকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। উল্লেখ্য এর চতুর্দশ দিনে তাঁদের সাথে খোদ ইয়ামেনের শাসনকর্তা শায়খ আলী ও সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর কাফেলায় যোগদান করেছিলেন। তিনিও তাঁর মুরীদ ছিলেন। আপন পীরের আকর্ষণে ও তাঁর বিদায় বিষাদ সহ্য করতে না পেরে সর্বোপরি দুনিয়ার বাদশাহীর উপরা দ্বীনের খিদমত তথা পরকালকে প্রধান্য দিয়ে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হযরত

শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি আপন মামার হুজুরা শরীফ থেকে বের হয়ে প্রথমে জন্মস্থানে ইয়ামেন গেলেন। আপন জন্ম ভূমিকে শেষ বারের মত দেখার জন্য এখানে এসে তিনি হযরত আবু সাঈদ তাবরিযী এবং হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর পবিত্র সঙ্গলাভ করে ফয়জপ্রাপ্ত হন। এখানে সাত বছর তাঁর সোহবতে অবস্থানকরেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত শাহ জালাল হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীনের পুত্র খলীফা হযরত বাহাউদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি খিদমতের দীর্ঘদিন যাবৎ আত্মনিয়োগ করেন। আসরারুল আউলিয়া নামক কিতাবে হযরত শায়খ ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শকর রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এই কঠিন খিদমতের সময়সীমা দীর্ঘ পঁচিশ বছর বলেও উল্লেখ করেছেন।

এবার হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি ইয়ামেন থেকে রওনা হলেন। অতঃপর প্রথমে বাগদাদ শরীফে তাশরীফ আনলেন। এখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর পারস্য অভিমুখে রওনা হন। পারস্যে কিছুদিন অবস্থান করলেন। এখানে তাঁর কামালিয়াত দেখে বহুলোক তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে ধন্য হয়। তাঁদের অনেকে তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করল। কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হযরত শায়খ শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর শিষ্য হিসেবে থাকাকালে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর সাথে পরিচিত হন। তারপর নিশাপুরে হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি সাথে সাক্ষৎ হয়। বাগদাদে থাকাকালে হযরত বাহা উদ্দীন যাকারিয়া মুলতান রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর সাথে ও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। অতঃপর তিনি বেলুচিস্থান হয়ে দিল্লীতে উপনীত হলেন্ বলাবাহুল্য দিল্লীতে মাহবূব ই ইলাহী হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি অবস্থান করতেন। হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মুরীদান ছিলেন। একজন মুরীদ গিয়ে তাঁর খিদমতে আরয করলেন হযরত শাহ জালাল নামের একজন কামিল ওলী সুদূর আরব থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছেন। তিনি পথ চলাকালে রুমাল দিয়ে মাথা মুবারক ঢেকে রাখেন। বিশ্রামের প্রয়োজন হলে কোন স্থানে তাবু খাটিয়ে নেন এবং তাঁর সাথে বহু সহচর রয়েছেন। তাঁর সহচরদেরকেও কামিল ওলী বলে মনে হয়। হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি ও তাকে কিছু পরীক্ষা করার মনস্থ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এক মুরীদকে পাঠিয়ে তাকে তার আস্তানা শরীফে দাওয়াত করলেন। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর নিকট এর কোনটাই গোপন থাকেনি। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। তবে এর পূবে একটি কৌটার মধ্যে কিছু তুলা রেখে এর উপর একটি জলন্ত অঙ্গার দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং তা দাওয়াতের বার্তাবাহক মুরিদের হাতে দিয়ে বললেন আমার তরফ থেকে তোমার সম্মানিত মুর্শিদকে এ উপহারটুকু দেবে। এর মাধ্যমে তিনি এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহর ওলীর তুলার মত সাদা ও কোমল হৃদয়কে অগ্নিরূপী দুনিয়ার মোহ বা পাপ স্পর্শই করতে পারেনা। কৌটা খুলে হযরত নিজাম উদ্দীন রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর এ মহান ওলীর বেলায়তের উচুস্তর সম্পর্কে বুঝতে কষ্ট হয়নি। তিনি এবার নিজেই হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তার তাবুতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং

সাদও আমন্ত্রন জানিয়ে নিজ আস্তানা শরীফে নিয়ে আসলেন। অতঃপর পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতার সাথে বহু বিষয়ে আলোচনা হল। এখানে দু মহান ওলীর মহামিলনে মারিফাতের স্রোতধার প্রবলভাবে ছুটে চলল। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি তার সফরসঙ্গী মুরীদান সহকারে বেশ কিছুদিন হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি রমমাহর মেহমানরূপে অবস্থান করলেন। তারপর তিনি সেখান থেকে আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন। আপন গন্তব্যে (পূর্ববঙ্গ) দিকে রওনা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি কে সুরমা রঙের এক জোড়া কবুতর উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে এ কবুতরের প্রচুর বংশ বিস্তার হল। এ কবুতর জালালী কবুতর নামে প্রসিদ্ধ হল।

এখানে রহস্যজ্ঞানীদের ধারনা হচ্ছে হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি পরীক্ষা করতে চাইলে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি তুলার উপর জ্বলন্ত অঙ্গার ভর্তি কৌটা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তাতে তার বেলায়ত অসাধারণ কাশফের প্রমাণ হয়েছিল ,আর হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এক জোরা কবুতর উপহার দিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে রূহানী সম্পর্কের সাথে সাথে বাহ্যিক সম্পর্কের ও যোগাযোগের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কারণ ওই যুগে দূরদূরান্তের খবরাখবর আদান প্রদানের অন্যতম বিশ্বস্ত বাহক ছিল কবুতর। দিল্লীতে অবস্থানকালে বহুলোক হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল। তাদের অনেকে তার সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। দিল্লী থেকে রওনা হবার সময় তার সফরসঙ্গীর সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ভারত এসে তিনি বদায়ূন এবং লক্ষ্ণৌতেও গমন করেন। এসব এলাকায় তিনি বহুলোককে ইসলামে দীক্ষিত করেন। উল্লেখ্য, লক্ষ্ণৌ বা লক্ষণাবতীতে অবস্থানকালে হিন্দুদের প্রধান মন্দিরের কাছে একটি গাছের নিচে আস্তানা গড়ে তোলেন। এবং অল্প দিনের মধ্যেএখানকার বহু হিন্দু ব্রাহ্মন ইসলাম গ্রহন করে। তারা নিজেরাই মন্দির ভেঙ্গে সেখানে মসজিদ নির্মান করল।

পূর্ববঙ্গের সিলেট গমনের প্রেক্ষাপট

বলাবাহুল্য, লক্ষ্ণৌ বা লক্ষ্ণণাবর্তী ছিল তদানীন্তন কালীন মুসলিম বাংলার রাজধানী। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি শুভ পদার্পনের ফলে এখানকার মানুষ একদিকে কুফর ও বে দ্বীনীর তমসা থেকে মুক্তি লাভ করেছিল অন্যদিকে লক্ষ্ণণাবর্তী ও পান্ডুয়া অঞ্চলের লোকেরা সেখানে বিরাজিত দৈত্য দৌরাত্ব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি অধ্যাতিক ক্ষমতাবলে এসব অন্তরায় দূরীভূত করে সেখানে শান্তিময় পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। এখান থেকেই হযরত শাহ জালাল *রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি বাংলাদেশে* ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত করেন।তদানীন্তনকালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। আর বাংলার শাষনকর্তা ছিলেন ইলিয়াস শাহ। তখন বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাও এদিকে তখনকার দিনে সিলেটের রাজা ছিল এক অত্যাচার ও মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু গৌড় গোবিন্দ। গৌড় গোবিন্দ ইতোপূর্বে ভারতের গৌড়ে তার দাপট ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সেখানে তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে লোকেরা তার পতন কামনা করেছিল। সেখানকার মহান ওলী হযরত শাহ জালাল গঞ্জে রাওয়া রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি জিহাদ করে গৌড় জয় করে নিলেন এবং ওই যালিম গোবিন্দকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে এসে সিলেটে তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। গৌড় থেকে এসেছিল বলে সে গৌড় গোবিন্দ নামে পরিচিত। গোবিন্দ সিলেটেও তার জোর যুলমের স্টীম রোলার চালাচ্ছিল। তখন গোটা সিলেটে গুটি কয়েক মুসলিম পরিবার বাস করত। তাই সর্বাধিক যুলমের শিকার হত। ইসলামকে কোন ধম, আর মুসলমানকে কোন জাতি বলেই সে স্বীকার করত না বরং মুসলিম ছিল তার মতে একটি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়। সুতরাং সিলেটের ওই মুষ্ঠিমেয় মুসলিম পরিবার যেন রাজা গোবিন্দের অনেকটা দয়ার উপর নির্ভর করে সেখানে কোন মতে কাল যাপন করত। আর তারা আল্লাহর দরবারে এ ফরিয়াদ করত যেন তাদেরকে এ যালিম থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ পাকের মর্জি গৌড় গোবিন্দের এক অকথ্য নির্যাতনই তার পতন এবং মুসলমানগণ তথা ওই বিশাল এলাকার মানুষের মুক্তির ওসীলা হয়ে গেল। সিলেটের টুলটিকার গ্রামে শায়খ বুরহান উদ্দীন নামক এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান সপরিবারে বসবাস করতেন। তিনি দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন তিনি আল্লাহর দরবারে মান্নত করলেন আল্লাহ পাক যদি তাকে একটি পুত্র সন্তাদ দান করেন তবে তিনি ছেলের আক্বীকায় একটি গরু যবেহ করবেন। তার ইচ্ছা পূরণ হল। আল্লাহপাক তাকে পুত্র সন্তান দান করলেন। সুতরাং তিনি মান্নত অনুসারে একটি গরু যবেহ করলেন। তাও অতি গোপনে যাতে কোন হিন্দু কিংবা রাজার লোকেরা জানতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মর্জি এদিকে শায়খ বুরহান উদ্দীন পড়লেন এক চরম পরীক্ষায় আর অন্যদিকে সিলেট কুফরমুক্ত হবার পথ সুগম হল। তা এভাবে যে একটি কাক হঠাৎ ছো মেরে গরুর এক টুকরো গোশত নিয়ে উড়ে গেল। কিন্তু তা সেটার ঠোট থেকে ছুটে রাজা গোবিন্দের প্রাসাদের অঙ্গিনায় পড়ল। তার রাজ্যে গরু যবেহ করা হল এটা সে সহ্য করতে পারল না। খবর নিয়ে সে শায়খ বুরহান উদ্দীনকে তজ্জন্য কঠোর শাস্তি দিল। তার ডান হাত কেটে ফেলল আর তার নবজাত সন্তানটিকে তারই চোখের সামনে তার দেব মন্দিরে বলি দিল (হত্যা করল)। এ হেন অমানুষিক অত্যাচার শায়খ বুরহান উদ্দীন এর যথাযথ প্রতিকারের জন্য দৃঢ় সংকল্প হলেন। কর্তিত হাতের ক্ষতস্থান একটু আরোগ্য হলে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। তিনি প্রথমে বাংলার রাজধানী সোনারগাওয়ে গিয়ে বাংলা শাসক ইলিয়াস শাহকে এ নির্যাতনের খবর জানালেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হলেন। তিনি তার পুত্র সেকান্দার শাহকে যথেষ্ট সৈন্য সমরাস্ত্র ও রসদ দিয়ে গোবিন্দেরবিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। খবর পেয়ে ধূর্ত গোবিন্দ ব্রহ্মপুত্র নদেরতীরেই একদল গুপ্ত সৈন্য নিয়োগ করল যেন অতর্কিত হামলা করে মুসলিম বাহিনীকে বাধাগ্রস্ত করে। তারা তাই করল। সেকান্দর শাহ ওই পথ ধরে সিলেটের দিকে অগ্রসর হবার সময় অতির্কিত আক্রান্ত হল। গোবিন্দ তার যাদুমন্ত্রের মাধ্যমে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেছিল বলেও জানা যায়। তার সৈণ্যদল বিপর্যস্ত হল। নিরুপায় হয়ে অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সেকান্দর শাহ রাজধানী (সোনারগাও) তে ফিরে গেল। এর অব্যবহিত পর বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ মৃত্যু বরণ করলেন। ফলে সেকান্দর শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। কিন্তু সিলেটের দিকে সৈন্য

প্রেরণ করা তিনি নিরাপদ মনে করলেন না। কারণ, তিনি তখন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন বাংলা দখল করার পরিকল্পনা করেছেন বলে আশঙ্কা করতেন। তাই, গৌড় গোবিন্দের সাথে সন্ধিকরে সন্ধির শর্তানুসাওে মুসলমানদেরকে নির্যাতন থেকে কিছুটা হলেও রক্ষার পথ অবলম্বন করলেন। বাস্তবেও এর কিছুটা ফল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শায়খ বুরহান উদ্দীন এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ, গোবিন্দ আত্মরক্ষার্থে মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিত নমনীয় হলেও সে বহাল তবীয়তে থেকেই যাচ্ছে এবং সুযোগ বুঝে পুণরায় তার অত্যাচার আরম্ভ করবেই। তাই শায়িখ বুরহান উদ্দীন দিল্লী পৌঁছে দিল্লীর সুলতান আলউদ্দীন ফিরোজ শাহর শরণাপন্ন হলেন এবং যাবতীয় অবস্থা জানিয়ে তার সাহায্য কামনা করেন। সুলতান আলাউদ্দীন শায়খ বুরহান উদ্দীন্দের অত্যাচারের সংবাদ শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ক্ষেপে ওঠলেন। ইতোমধ্যে "তরফ'র হিন্দুরাজা আচক নারায়ণের মুসলিম-নির্যাতনের কাহিনীও তার কানে আসল। সুতরাং তিনি বাংলা থেকে হিন্দু শাসনের চির উৎখাতের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। সে জন্য তিনি একদল সৈন্যসহ সেনাপতি সেকান্দর গাযীকে প্রথমে সিলেটের দিকে প্রেরণ করলেন। সেকান্দর গাযী রণ নিপুণ সেনাপতি ছিলেন; কিন্তু তার সৈন্যরা ছিল তুর্কী, তদুপরি, আবহাওয়া ছিল আর্দ্র। কারণ তখন ছিল বাংলায় বর্ষাকাল। সুতরাং তার সৈন্যরা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। ফলে সেকান্দর গাযী অসুবিধায় পড়ে গেলেন।

ওদিকে গোবিন্দ মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে মোকাবেলার জন্য ব্যাপক সমরসজ্জা আরম্ভ করে দিল। তাই, সেকান্দর গাযী ব্রক্ষপুত্র নদের তীরে ছাউনি গেড়ে দিল্লীরসম্রাটের নিকট অধিক সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দিল্লীর সম্রাট (আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ) সকলের সাথে পরামর্শ করে সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন নামক জনৈক সেনানায়ককে সেনাধ্যক্ষ করে অতিরিক্ত সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন। সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। রাজনৈতিক কারণে তিনি সেখান থেকে হিজরত করে ভারতে আশ্রয় নেন। আর জীবিকার তাগিদে তিনি দিল্লী সম্রাটের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। প্রকাশ্যে সেনানায়ক হলেও তিনি ছিলেন এক কামিল ওলী। সম্রাট এক অলৌকিক উপায়ে তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি যখন বাংলার অবস্থা নিয়ে চিন্তিত এবং কাকে অতিরিক্ত সৈন্যও অধিনায়ক করে পাঠাবেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাকে বললেন, বাংলার দিকে অভিযান সফল হবে তবে সেকান্দরগাযীর মাধ্যমে নয় বরং অন্য একজনের মাধ্যমে। আর ওই ব্যক্তির পরিচয় হবে আসন্ন প্রবল ঝড়ের সময়ও তার বাতিটি নির্বাপিত হবে না জ্বলতে থাকবে। সুতরাং ঘটনাচক্রে দেখা গেছে প্রবল ঝড়ের সময়ও সেনা ছাউনীতে একজন লোকের বাতি জ্বলছিল। আর তিনি ছিলেন সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন। দিল্লী সম্রাট তখন সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীনকে সেনাধ্যক্ষ ঘোসণা করলেন এবং নিয়োগপত্র প্রদান করে একদল সৈন্যসহ সিলেটের দিকে পাঠালেন।

ওদিকে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহিও দিল্লী থেকে বের হয়ে তখন এলাহাবাদে পৌছেছিলেন। তখন তাঁর সাথে ছিলেন তিনশ এগার জন শিষ্য। তাঁরা সবাই ইসলামের অমীয় বাণী পৌছাতে পৌছাতে বাংলার দিকে আসছিলেন। উল্লেখ্য, দিল্লী সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন দিল্লীতে থাকাকালে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর শুভাগমনের খবর

শুনলেও একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাঁর সাথে সাক্ষৎ করতে পারেননি। তখন সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন ছিলেন একজন সাধারণ সৈন্য। আর এখন যেহেতু তাঁর উপর এক গুরুদায়িত্ব অর্পিত হল, সেহেতু হযরত শাহ জালাল এরকম বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ও দোআ গ্রহণ করা তিনি জরুরি মনে করলেন। কারণ, চেষ্টর সাথে আল্লাহর প্রিয় বান্দার দোআ সমন্বিত হলে সফলতা নিশ্চিত হয়ে যায়।

সুতরাং সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন এলাহাবাদে গিয়ে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আর সিলেটের গোবিন্দ ও তরফোর আচক নারায়ণের মুসলিম নির্যাতন এবং খোদাদোহিতার সব ঘটনা আরয করলেন। তদুপরি, তাঁর অভিযানের কথাও জানালেন। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এটা একটা ধর্মীয় যুদ্ধ, নিছক রাজা জয়ের যুদ্ধ নয়। আল্লাহ সহায় হোন! আমি ও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। এট শুনে সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহর শুকর আদায় করলেন। কারণ তিনি দোআর জন্য এসে দোআর ভান্ডারও সাথে গেছেন। তাছাড়া, এরই মাধ্যমে অস্ত্রের শক্তির সাথে আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয় ঘটেছে। বরং যেখানে ইতোপূর্বে অস্ত্রের শক্তি নিষ্ফল হয়েছে সেখানে বেলায়তী শক্তি বিজয়কে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে নিশ্চিতই করতে যাচ্ছে। তখন হযরত শাহ জালালের সাথে ৩১১ জন শিষ্য ছিলেন। সুতরাং সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি সমবিভ্যহারে এস ব্রক্ষপুত্র নদের তীরেঅপেক্ষামান সেকান্দার গাযীর সাথে মিলিত হলেন এবং গোটা সেনা বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ চূড়ান্ত অভিযানে কার্যতঃ হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তাঁরই নির্দেশক্রমে বাহিনী পরিচালিত হচ্ছিল। সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন তাঁরই পরামর্শ ও নির্দেশ মত কাজ করছিলেন।

অগ্নিবাণ প্রতিহত করে সিলেটে প্রবেশ

মুসলিম বাহিনী গৌড় রাজ্যের দক্ষিণ সীমানায় নবীগঞ্জের নিকটে চৌকি নামক স্থানে উপনীত হলে গৌবিন্দ বাহিনী আগের মত গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করল। এমনকি তারা মুসলিম বাহিনীর দিকে যাদুমন্ত্রে সাহায্যে অগ্নিবাণ ও নিক্ষেপ করছিল। আর তাদের এ প্রচন্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলে মুসলিম বাহিনীকে পূর্বের ন্যায় পরাস্ত হয়ে ফিরে যেতে হত। কিন্তু তখন হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর বেলায়তী দৃষ্টিতে ওই অগ্নিবাণ মুসলিম বাহিনীর দিকে না এসে উল্টো গৌবিন্দ বাহিনীকে জ্বালিয়ে দিল্ আর অবশিষ্টরা তাৎক্ষণিকভাবে পালিয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী এগিয়ে চললেন। কিন্তু বাহাদুর পুরের নিকট এসে বারাক নদীর তীরে এসে থামল কারণ, নদী পার হবার কোন ব্যবস্থা তখন সেখানে ছিল না গোবিন্দ মুসলিম বাহিনীর পথ রোধ করার জন্য আগেভাগে সব পারাপার বন্ধ করেদিয়েছিল। কিন্তু হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘোষণা দিলেন, তৈরী হও! নৌযান ছাড়াই নদীপার হতে হবে ঘোষণা শুনে প্রথমে সবাই অবাক হলেও দেখা গেল হযরত শাহ জালাল তাঁর মৃগচর্ম নির্মিত জায়নামায খানা পানির উপর বিছিয়ে দিয়েন। তা তখন বিরাটকার নৌযান হয়ে গেল। গোটা সৈন্যদল তাতে চড়ে নদী পার হয়ে গেল। যেখানে মুসলিম বাহিনী অতিকষ্টে দুটি বাধা অতিক্রম করে আসতে হত, নতুবা বিপর্যস্থ ও বাধাগুস্ত হয়ে থাকতো, তাঁরা

সেখানে অনায়াসে, বিনা বাধায় সিলেটের কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মহান ওলীর কৃপাদৃষ্টি ও অদম্য বেলায়তী শক্তি মুসলিম বাহিনীর সামনে প্রতিটি বাধাকে একের পরা এক করে দুরীভূত করে দিচ্ছে! তাঁরা পূর্ব দিকে যাত্রা করে শেখ ঘাটের দক্ষিণে, বর্তমানে রেল স্টেশনের কাছে সুরমা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। খেয়া পারাপার এখানেও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। হযরত শাহ জালাল পূর্বেও ন্যায় এবারও পানিতে আপন জায়নামায বিছিয়ে দিলেন এবং গোটা সেনা বাহিনীকে পার করিয়ে নিলেন।

সিলেট জয় ও ইসলামী পতাকা উড্ডীন ঃ-

মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি দেখে রাজা গৌড় গৌবিন্দ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তবে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য সে এক কৌশল অবলম্বন করল। রাজা গোবিন্দর অস্ত্রাগারে একটি লৌহ নির্মিত ধনুক ছিল। কোন বীরপুরুষ এ যাবৎ তাতে শর সংযোজন করতে পারেনি। রাজা ওই ধনুকটি এ বলে মুসলিম বাহিনীর নিকট পাঠালো যে, যদি কোন মুসলিম সৈন্য তাতে শর সংযোজন করতে পারে, তবে সে বিনা দ্বিধায় তাঁদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ কঠিন শর্তও হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, সেনাবাহিনীতে যে লোকটি জীবনে আসরের নামায কাযা করেননি সে যেন এগিয়ে আসে। গোটা সেনাবাহিনী স্তব্ধ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন এগিয়ে এলেন। হযরত শাহ জালাল তার হাতে ধনুকটি দিয়ে বললেন, তুমিই তাতে শর সংযোজনস কর। কাজটি মোটেই সহজসাধ্য ছিলনা। কিন্তু আপন মুর্শিদের নির্দেশ পালনার্থে তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে ধনুকে চাপ দিলেন। অমনি জ্যা বাকা হয়ে মধ্যবৃত্ত সম্প্রসারিত হল। আর তখন তিনি তাতে শরসংযোজন করে দিলেন। অতঃপর হযরত শাহজালাল শর সংযোজিত ধনুকটি রাজা গোবিন্দের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আর বলে পাঠালেন, গোবিন্দ! তুমি মুসলিম বাহিনীর শক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলে। এই নাও তার নমুনা। এ সব কারামত দেখে রাজা গৌড় গোবিন্দ নিশ্চিত হল যে, সে মুসলিম বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারবে না। তাই, সে গড়দুয়ারস্থ দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। এদিকে হযরত শাহ জালাল রাজার প্রধান সেনাপতি মনা রায়ের দূর্গ অবরোধ করলেন। দূর্গটি একটি টিলার উপর থাকায় সুরক্ষিতছিল। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহ চট নামক তাঁর এক শিষ্যকে দূর্গের উপর উঠে আযান দিতে বললেন। শাহ চট আযানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে দূর্গেরদরজা খানখান হয়ে আঙ্গিনায় পতিত হল। আর মুসলিম বাহিনী অনায়াসে বীরবিক্রমে, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বনি তুলে শহরে প্রবেশ করলেন। আর সিলেটের বুকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হল।

হযরত শাহ জালালকে এক পলক দেখার জন্য গোবিন্দের তদবীর

যে মহান ওলীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার বলেই এ অসাধ্য সাধন হল, তাঁকে এক নজর দেখার জন্য রাজা গোবিন্দের মনে বড় সাধ জন্মালো। সে সাপুড়িয়ার এক পেটিকায় ঢুকে ঢাকনা বন্ধ করে পেটিকার ছিদ্র দিয়ে তাকে দেখার ব্যবস্থাকরল। মহান ওলীর নিকট এটাগোপন থাকেনি। সুতরাং সাপুড়িয়া হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহির সামনে আসলে তিনি সাপুড়িয়াকে ওই

পেটিকার ঢাকনা খুলতে বললেন, যাতে গোবিন্দ লুকিয়ে ছিল। গোবিন্দ এবার ভীত ও লজ্জিত হয়ে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সামনে করজোড় হয়ে দাঁড়াল। তিনি গোবিন্দকে বললেন, তুমি তো বীরের মত আসার সাহস কর না। করবেও বা কি করে? তোমার কর্তব্য ছিল জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা। কারণ, তুমি ছিলে দেশের রাজা।। কিন্তু তুমি তা না করে মুসলমানদেরপ্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করেছ, তার প্রতিফল স্বরূপ তোমার আজ এ অবস্থা হয়েছে। তোমার এখন কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। গোবিন্দ তার সব অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করল হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, তুমি ক্ষমার উপযোগী নও। তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু মনে রেখো! আর কখনো মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করোনা। এরপর সে সিলেট থেকে কাছাড়ের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। তার শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায়নি। সিলেটে স্থায়ীভাবে মুসলিম বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

সিলেটে আস্তানা স্থাপন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মামা শায়খ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি একমুষ্ঠি মাটি দিয়ে বলেছিলেন রঙ, রূপ ও স্বাদে যেখানকার মাটির মিল থাকবে সেখানে বসবাস করতে। ওই মাটি হযররত শাহ জালাল আপন একজন শিষ্য চাষনী পীরকে সংরক্ষণ করতে দিয়েছিলেন। সিলেট জয়ের পর ওই মাটি মিলিয়ে দেখা হলে উভয় মাটি মধ্যে অভিন্নতা ও সামঞ্জস্য পাওয়া গিয়েছিল। হযরত আহমদ কবীর যেন সুদূর ইয়ামেনে থেকে সিলেটের এ মাটি সংগ্রহ করে এখানে আসারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন থেকে সিলেটেই স্থায়ী ভাবে আস্তানা গড়ে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইয়ামেন থেকে রওনা হবার সময় তাঁর সাথে ছিলেন মাত্র ১২ জন শিষ্য, দিল্লী থেকে রওনা হবার সময় ওই সংখ্যা দাড়ায় ৩১১ জনে। আর সিলেট পৌছার সময় তা ৩৬০ জনে উন্নীত হয়। তাই সিলেটের অপর নাম ৩৬০ আউলিয়ার দেশ। এরপর সিলেটকে কেন্দ্র করে এ মহান ওলীর ধর্মপ্রচার অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এখান থেকে তিনি তাঁর ওই ৩৬০ ওলীর অধীনে বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় মিশন পাঠাতে থাকেন। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষীত হয়েছিল। যে সিলেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে গোবিন্দের রাজত্বকালে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মুষ্ঠিমেয় সেখানে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর শুভাগমনের পর থেকে আজ অমুসলমানের সংখ্যা একেবারে নগণ্যের কোঠায়।

উল্লেখ্য, হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট বিজয়ের পর সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীনকে তরফের অত্যাচারী হিন্দু রাজা আচক নারায়ণকে দমন করার জন্য ১২ জন ওলীকে প্রেরণ করেছিলেন। এ মুষ্ঠিমেয় ওলীর দলটি আচককে পরাভুত করে সেখানেও ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন। তদুপরি, ওই ১২ জন ওলী এরপর তরফেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান করে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অন্যান্য শিষ্যেরমধ্যে তাঁর ভাগ্নে হযরত শাহ

পরাণ, খাজা আদিনা, শাহযাদা আলী, হযরত চাষনী পীর, হযরত শাহ বদর, কল্লা শহীদ পীর, পীর জালাল উদ্দীন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লী সুলতানের পক্ষ থেকে নিয়োজিত সেনানায়ক দ্বয় সেকান্দরগাযী এবং সাইয়্যেদ নাসির উদ্দীন ও হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাতে বায়আত গ্রহণ করে, তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেন এবং বেলায়তের উচ্চতর স্তরেউন্নীত হয়েছিলেন আর পরবর্তীতে ইসলামের বড় বড় খিদমত আঞ্জাম দেন। প্রায় সব শিষ্যকে তিনি হিদায়াতের আলো বিস্তারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাথে রেখেছিলেন শুধু হাজী ইয়ুসুফ, হাজী খলীল এবং ইয়ামেনের শাহযাদা আলী ইয়ামেনী রহমাতুল্লহি আলায়হিমকে। সিলেটের যেখানে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন আস্তানা গড়েছেন ওই স্থানটি এখন সিলেটের কেন্দ্রস্থল ও প্রধান শহর।এখানে তিনি একটা কূপ খনন করে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করেছিলেন যে, আল্লাহ সেটার সাথে জমজম কূপের স্রোতধারাকে মিলিত করে দেন। এরপর তিনি একটি লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। আল্লাহ পাকের কুদরতে জমজমের একটি স্রোত সেটার সাথে মিলিত হয়ে যায়। এ বিষয়টি পরীক্ষিত।

সিলেটের খিত্যা পরগণার অধিবাসী জনৈক আব্দুল ওয়াহহাব হজ্ব করতে গিয়ে নয়টি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করলেন। কিন্তু সফরে এ স্বর্ণমুদ্রা তাঁর সাথে থাকলে তিনি প্রাণনাশের আশংকা করলেন। তাই তিনি ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো একটি বাশের চোঙ্গার পুরে নিয়ে মক্কা মুকাররামায় জমজম কূপে নিক্ষেপ করলেন (তখন জমজমের মুখ খোলা ছিল)। আর আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ যদি তোমার ওলী হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কথা সত্য হয়, তাহলে এ চোঙ্গাটা সিলেটে হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর দরগাহ শরীফের কূপে পৌছিয়ে দিও বাস্তবে তাই হল। এ দিকে দরগাহর খাদিম এর পরক্ষণে চোঙ্গাটি কূপে দেখতে পান এবং নিজের নিকট সংরক্ষণ করে রাখলেন। হাজী আব্দুল ওয়াহহাব হজ্ব থেকে ফিরে এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। খাদিম চোঙ্গাটি তাঁর হাতে দিলেন। হাজী সাহেব তার থেকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা খাদিমদের হাদিয়া স্বরূপ দিয়ে বাকি গুলো নিয়ে যান।

ওফাত ঃ-

হযরত শাহ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৫০ বছর বয়সে ২০ যিলক্বদ ৭৪৮ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। সিলেটের কেন্দ্রস্থলে তাঁর আস্তানা শরীফেই তিনি সমাহিত হন। তাঁর মাযার শরীফ ফুযূজ ও বরকতের অনন্য ভান্ডার। তিনি আপন জীবদ্দশায় যেভাবে আল্লাহর বান্দাদের উপকার করতে থাকেন, ইন্তিকালের পরও তাঁর মাযার শরীফ দোআ কবুল হবার বরকতময় স্থান। দেশ বিদেশের অগণিত মানুষ তাঁর ফয়য ও বরকত লাভের জন্য তাঁর মাযার শরীফ যিয়ারত করতে ছুটে আসেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত (ইনশা আল্লাহ) এ মহান ওলী আপন মহিমায় মাযার শরীফ থেকে ফুযূজ ও বরকত বিতরণ করতে থাকবেন। এ মহান ওলীর সংস্পর্শে এসে অগণিত মানুষ শুধু মুসলমান হয়নি, বরং অনেকে বেলায়তের উচ্চাসনে সমাসীনও হয়েছেন। এটা তাঁর সোহবত বা বরকতময় সঙ্গেও বৈশিষ্ট্যই ছিল। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হলে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায়। ১৬৯৭ সালে ঢাকার ফৌজদার মুরাদ বখশ হযরত শাহ জালালের দরগাহ এর জন্য একটি বড় ডেগ প্রস্তুত করে (ওজন ৫ মন সাড়ে তিন সের) বুড়িগঙ্গা নদীতে সিলেটের দরগাহ শরীফের উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে

দিয়েছিলেন। ওই ডেগটি ভাসতে ভাসতে সিলেটের চাঁদনী ঘাটে গিয়ে ভিড়েছিল। ডেগটির গায়ে প্রস্তুতকারক ও পেরকের নাম লিপিবদ্ধ ছিল। আরো লিখা ছিল, এটাসিলেটের দরবারের জন্য পাঠানো হলো। ডেগটি কেউ দরবারের সীমানার বাইরে নেবেন না ইত্যাদি। চাঁদনী ঘাটে ডেগটি এসে পৌছলে অনেক লোক তা দেখতে গেল এবং অনেকে উঠানোর জন্য ধরতে চেয়েও ব্যর্থ হল। অবশেষে খাদিম আবুল আব্বাস আহমদ সাহেব গিয়ে তা তুলেনিয়ে আসলেন। তাঁর পবিত্র দরবারে তাবাররুক হিসেবে অনেক কিছু রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর ব্যবহৃত মৃগচর্ম, যুলফিকার নামের তরবারি, খড়ম ও দুটি তামার পেয়া অন্যতম। তিনি প্রতিদিন ফজরের নামায খানা ই কাবায় পড়তেন এবং প্রতিবছর হজ্ব পালন করতেন বলে জানা যায়। এটাআল্লাহর ওলীগণের জন্য অসম্ভব নয়। আল্লাহর ওলীগণের কারামত সত্য। পরিশেষে, এ উপমহাদেশে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের সিলেট ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে হযরত শাহ্ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর অবদান চিরদিন স্মরনণীয় ও অম্লান হয়ে থাকবে। আমাদের দেশ ও জাতির জন্য এট অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে, তিনি সুদূরইয়ামেন থেকে এ ভু-খন্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ফলে এ দেশের অগণিত মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পান এবং তাঁর মাযার শরীফ ও এর অসাধারণ বরকতও এদেশের ভাগ্যে জুটেছে।

সুতরাং তাঁর আদর্শকে আকড়ে ধরে তা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করলে উভয় জাহানের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুঃখের বিষয়! এ মহান ওলীর আদর্শ বাস্তবায়নের প্রতি কালক্রমে একদিকে মুসলমানগণ উদাসীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায় এদেশে তাদের বাতিল মতবাদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠেছে। এমনকি হযরত শাহ্ জালাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযার শরীফের পাশে গড়ে ওঠেছে বিরাট ওহাবী মতবাদী প্রতিষ্ঠান। আর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবাধে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে ওলী বিদ্বেষীরা। আসুন! আমরা আউলিয়া-ই কেরামের অবদানগুলোর প্রতি যত্নবান হই এবং তাঁদের আদর্শ্যে প্রতিষ্ঠায় সচেতন হই। যাতে তাঁদের ফুয়ূজাত ও বরকাত লাভে আমাদের দ্বীন দুনিয়া উভয়ই সফল হয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু আকবার
নারায়ে রিসালাত — ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ,
রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ এশা হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে
মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

মূল-হযরাতুল আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর(রহঃ)

ওয়াদা রক্ষা

একদিন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দরবারে বিচার কার্য চলছিল। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন মামলার মীমাংসা করা হচ্ছিল। সে সময় দু'জন যুবককে ধরে দরবারে নিয়ে আসলো এবং আরজি পেশ করলো, হে আমীরুল মুমেনীন ! এ জালিম থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন। সে আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে মেরে ফেলেছে। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই যুবকের দিকে তাকায়ে দিকে তাকায়ে জিজ্ঞেস করলেন- ওদের আরজির কথাতো তুমি শুনেছ। এখন তোমার কি বক্তব্য আছে ? সে খুবই আদবের সাথে অপরাধ স্বীকার করে বললো, সত্যিই আমি এ অপরাধ করেছি। রাগের মাথায় আমি এক পাথর নিক্ষেপ করে ছিলাম, যার আঘাতে সেই বৃদ্ধ লোকটি মারা গেছে। আমার রাগের কারণ হলো, লোকটি আমার প্রান প্রিয় উটটিকে ওর বাগানে ঢুকার কানণে মেরে চোখ ফুটা করে দিয়েছে।

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) সব কথা শুনার পর তাঁর রায়ে বললেন তোমার থেকে যেহেতু স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি পাওয়া গেছে, সেহেতু তোমার বেলায় কেসাসের হুকুম প্রযোজ্য। সেই বৃদ্ধের জানের বদলে জান দিকে হবে। যুবকটি মাথানত করে আরয করলেন, শরীয়তের হুকুম ও ইমামের রায় মানতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে একটা বিষয়ে আবেদন করতে চাই। জিজ্ঞোস করা হলো, বিষয়টা কি ? আমার একজন ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই আছে, যার জন্য আমার মরহুম পিতা কিছু স্বর্ণ রেখে গেছেন, যেটা আমার জিম্মায় আছে। আমি সে গুলো এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি এবং এর খবর আমি ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। আমি যদি সেই স্বর্ণগুলো ওকে হস্তান্তর করতে না পারি, তা হলে কেয়ামতের দিন আমি দায়ী হবো। এ জন্য আমাকে তিন দিনের জন্য জামিনে ছেড়ে দেয়ার আবেদন করছি।

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে একটু চিন্ত করলেন। অতপর বললেন, তিন দিন পর কেসাসের হুকুম কার্যকারি করার জন্য তুমি যে ফিরে আসবে এর জামিন কে হচেছ ?

ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এ বক্তব্যের পর যুবটি চারিদিকে তাকাকে দরবারে উপস্থিত সবার চেহারার উপর চোখ বুলায়ে নিল। অতপর হযরত আবু জর গেফারী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দিকে ইশারা করে আরয করলো, ইনি আমার জামিন হবেন। হযরত ফারুকে আযম জিজ্ঞেস করলেন, আবু জর, তুমি এ জামিন হচ্ছ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি এর জামিন হচ্ছি। সে তিন দিন পর যথা সময়ে উপস্থিত হবে।

যেহেতু একজন বিশিষ্ট সাহাবী জামিন হলেন, সেহেতু হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) রাজি হয়ে গেলেন এবং বাদী যুবকদ্বয়র সম্মতি প্রকাশ করলে ওকে ছেড়ে দেয়া হয়।

তৃতীয় দিন পুনরায় যথারীতি দরবার বসলো। বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম উপস্থিত হলেন, বাদী যুবকদ্বয় ও আসলো, হযরত আবু জর গেফারীর তশরীপ আনলেন এবং নিদিষ্ট সময়ে অপরাধীর আগমনের অপেক্ষায় রইলেন। সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু সেই অপরাধীর কোন পাত্তা নেই।

বাদীদ্বয় হযরত আবু জরকে জিজ্ঞোস করলেন, জনাব, আমাদেও আসামী কোথায় ? হযরত আবু জর পূর্ণ আস্থা সহকারে বললেন, যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে না আসে, তাহলে খোদার কসম কওেরবলছি, আমার জামানত পূর্ণ করবো। হযরত ফারুকে আযম মসনদে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন এবং কিছুক্ষণ পর

বললেন, সে যদি না আসে, তাহলে তার জিম্মাদার আবু জরের বেলায় সে হুকুম কার্যকরি হবে, যেটা ইসলামী বিধান মতে প্রযোজ্য।

এটা শুনামাত্র সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। অনেকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং অনেকের চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। তাঁরা বাধ্য হয়ে বাদীদ্বয়ের কাছে গিয়ে বলতে লাগতেন, তোমরা জানের বিনিময়ে অন্য কিছু গ্রহণ কর। ওরা অস্বীকার করে বললো আমরা রক্তের বদলে রক্ত চাই। সাহাবায়ে কিরামের এ পেরেশানী অবস্থায় হঠাৎ সেই অপরাধী যুবক এসে উপস্থিত হলো। তখন সে খুবই ঘামার্ত ছিল এবং খুব ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছিল এবং আসা মাত্রই হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সামনে গিয়ে সালাম করলো এবং আরয করলো "আমি আমার ছোট ভাইকে মামাদের কাছে সোপর্দ করে এসেছি এবং ওর সহায় সম্পত্তি ওনাদেরকে বুঝায়ে দিয়ে এসেছি। এখন আল্লাহ ও রাসুলের যা হুকুম, তা কার্যকর করুন আমি প্রস্তুত।

হযরত আবু জর গেফারী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! খোদার কসম, আমি একে চিনিও না এবং সে কোথাকার লোক তার জানি না। কিন্তু সে সবাইকে বাদ দিয়ে যখন আমাকে ওর জামিন বললো, তখন সেটা অস্বীকার করতে আমার বিবেক বাঁধা দিয়েছিল। তাই আমি ওর জামিনদার হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই অপরাধী যুবক আরয করলেন, আমি হযরত আবু জরের শুকরীয়া আদায় করছি, আমি না আসলে ওনার বড় বিপদ হতো। কিন্তু মুসলমান যে কোন অবস্থায় স্বীয় ওয়াদা রক্ষা করে, কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করে না।

ওর আগমনে সবার মনে স্বস্তি আসলো, এমন কি বাদীদ্বয় সন্তুষ্টি হয়ে মহামান্য দরবাওে আরয করলো, আমীরুল মুমেনীন! আমরা আমাদের পিতার রক্তের দাবী মাফ করে দিলাম।

এটা শুনা মাত্র উপস্থিত সবাই আনন্দে নারায়ে তকবীর বলে উঠলেন এবং হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর চেহারা মোবারকের খুশীর লক্ষণ ফুটে উঠলো এবং বাদীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের পিতার রক্তের বিনিময় আমি বায়তুল মাল থেকে আদায় করবো। বাদীদ্বয় আরয করলো, হুযূর আমাদের কিছু নেয়ার প্রয়োজন নেই আমরা কিছু নিব না।

পরিশেষে আনন্দঘন পরিবেশে আদালতের কার্যক্রম সমাপ্ত হলো(মগনিউল ওয়ায়েজীন ৪৭৯ পৃঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছিলেন মানবতাবাদী, সদ্বাচরণকারী এবং ওয়াদা পালনকারী। মৃত্যুদণ্ডের আসামী হওয়া সত্ত্বেও ওয়াদা মুতাবেক যথা সময় এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ওয়াদা রক্ষাকারী ও সত্যিকার মুসলমান ছিলেন। কিন্তু আজকাল আমরা ওয়াদার প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করি না।

উপযুক্ত বিচার

হযরত ফারুকে আযক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) মিসরের গভর্ণর ছিলেন। একবার হযরত আমর ইবনুল আসের ছেলে এক মিসরী যুবকের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিল এবং মিসরী যুবকটি অগ্রগামী হয়েছিল। এতে হযরত আমর ইবনুল আসের ছেলে রেগে মিসরী যুবকটিকে দোর্রা মারলো। মিসরী যুবকটি এ জুলুমের ফরিয়াদ নিয়ে হযরত ফারুকে আযকের দরবারে হাজির হলো এবং আরজি পেশ করলো যে, ওকে গভর্ণরের ছেলে অনর্থক দোর্রা মেরেছে। হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আমর ইবনুল আসকে পেয়ে গভর্ণর ছেলে সহ হাজির হলেন। আমীরুল মুমেনীন ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মিসরী যুবককে নির্দেশ দিলেন দোর্রা হাতে নাও এবং তোমাকে যে দোর্রা মারছে, ওকে মারো। তখন সে বদলা নিতে শুরু করলো এবং ফারুকে আযম বলতে ছিলেন, আরো

মারো। হযরত আনস (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, সে এতটুকু মেরেছিল যে, আর যেন না মারে আমরা সেটাই কামনা করছিলাম। যখন মিসরী যুবকটি ওকে দোর্রা মারা থেকে অবসর হলো, তখন ফারুকে আযম ফরমালেন, এবার এ দোর্রাটি আমর ইবনুল আসের মাথার উপর রেখো। কারণ তিনি তথাকার গভর্ণর ছিলেন। তিনি কেন বিচার করলেন না এবং কেন ছেলের পক্ষপাতিত্ব করলেন? মিসরী যুবকটি আরয করলো, হে আমীরুল মুমেনীন! ওনার ছেলে আমাকে মেরেছিল, আমি ওর থেকে বদলা নিয়েছি। ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) কে বললেন, তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কখন থেকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছ? অথচ ওরা মায়ের পেট থেকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। হযরত আমর ইবনুল আস (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আমি কিছুই জানতাম না এবং এ লোকটি আমার কাছে কোন অভিযোগর করেনি। তখন ফারুকে আযম ওনাকে মাফ করে দিলেন। (আল আমন ওয়াল উলা- ২৪৫ পৃঃ)

শহীদের বাসনা

***সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন**

শহীদের বাসনা, ছিল বুঝি কামনা
পূরণ করলেন রাব্বানা,
প্রেমিক মনের বাসনা
সালাম জানাই তোমায়, ওহে মাওলানা।।
সত্য প্রচারিতে ছিল না ভয় যার হিয়াতে
সত্যের সৈনিক সুন্নিয়তের বীর
বাতিলের সামনে যাহার হয়নি নত শির
তাই বুঝি হায় দুশমনেরা
করিলো মোদের প্রিয় হারা
দুশমনে রাসূল তোরা পার পাবিনা।।
সুন্নিয়তের বীর জনতা
মুছে ফেলে সকল ব্যাথা
শহীদ ফারুকীর রক্ত
বৃথা যেতে দিওনা
ইনশাআল্লাহ সহায় মোদের
আল্লাহ পাক রাব্বানা।
বাংলার বুকে মোরা সুন্নি মুসলমান
ভূলবোনা কভূ কেহ তোমারই নাম
প্রিয় মোদের শায়খ নুরুল ইসলাম
তোমার অবদান কভূ ভুলা যাবে না
ওহে সুন্নীয়তের প্রাণ
মোরা তোমায় ভূলবোনা।।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত
নারায়ে গাউছিয়া

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম জামে মসজিদ

শাহজাহানপুর, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা খতীব: উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ.জলিল (র:)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজ গুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি
০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী
০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহাজাহানপুর, ঢাকা।